Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরুন্নাহার খানম

রোলঃ ২৩১০০১২০০০৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরুন্নাহার খানম
রোলঃ ২৩১০০১২০০০৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম ও গণতন্ত্র ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরুন্নাহার খানম, আইডিঃ ২৩১০০১২০০০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নুরুন্নাহার খানম

আইডিঃ ২৩১০০১২০০০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রতিপাদ্যসার 6

ভূমিকা 7

গবেষণা পদ্ধতি 9

গণতন্ত্রের পরিচয় ও উৎপত্তি 9

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা 10

জ্বিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ বাস্তবায়ন করা 11

তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ..12

কালিমার রুকন 15

তাগুতের সংজ্ঞা 16

দ্বীন-ইসলামের হাকীকত 19

শিরকঃ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 19

ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ...26

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদা.......................................29

কোন মুসলিম দেশের শাসকের কাফের হওয়ার কারণ...31

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে কুরআন থেকে দলীল 32

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে সুন্নাহ থেকে দলীল...49

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে ইজমা থেকে দলীল 53

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে কিয়াস থেকে দলীল 55

ফুকাহায়ে কেরামের ফতওয়ার সারমর্ম..57

ইতিহাস কী বলে? 59

মানবরচিত সংবিধানের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি 62

দ্বীন কী? 64

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য...67

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়ে সংশয় নিরসন......................69
গণতন্ত্র (Democracy) কুফর কেন?...72
ইসলামী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য 74
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত পদক্ষেপ........................75
প্রচলিত গণতন্ত্র 87
প্রচলিত ভুয়া গণতন্ত্রের ত্রুটি 88
ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা 88
ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য...93
ইসলামী জীবনব্যবস্থাতেই স্থিতিশীলতা 96
পৃথিবীতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা 105
শেষের আগে...116
উপসংহার: 119
তথ্যসূত্রঃ...120

প্রতিপাদ্যসার

স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক মানুষ স্বদেশে স্বাধীনভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে চায়। রাজনৈতিক সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা কেউ কামনা করেনা। তথাপি ক্ষমতার লোভে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নেতারা ক্ষমতা লাভ করতে অথবা লভ্য ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে নানা অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব বা বিচার বিভাগের নিষ্ক্রিয়তাকে মূল কারণ হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলেও মূলত নৈতিক অবক্ষয় ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন সহ একাধিক কারণ এর সাথে জড়িত।" মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষই সমান"-এ মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রতিষ্ঠিত করার কথা প্রচলিত গণতন্ত্রে বলা হলেও মূলত অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার আড়ালে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হীন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ফলশ্রুতিতে কাগজে কলমে জনস্বার্থ সম্বলিত নীতিমালা বিধিবদ্ধ থাকলেও নিদিষ্ট সময় পর জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য কোন সুফল জনগণ ভোগ করতে পারেনা। এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত না হওয়ার দরুণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বা সমালোচনা করার অধিকারও ক্ষেত্রবিশেষে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সাধারণ জনগন কর্তৃক শাসকদের সমালোচনা সহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যের বাস্তবায়ন ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সাধারণ চিত্র। ফলশ্রুতিতে ইসলামী গণতন্ত্রের নীতিসমূহ আজও সকল রাষ্ট্রের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে আছে। এ আদর্শ হতে বিমুখ হওয়ার দরুণ বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করে। ফলে শোষিত জনগণ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্যাতিত জনগণের আন্দোলন ও বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী এরই ইঙ্গিত বহন করে। ২০২৪ এর জুলাই মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত জুলাই বিপ্লব মূলত অধিকার বঞ্চিত জনগণের অধিকার আদায়ের তেমনই এক লড়াই। দীর্ঘদিন যাবত গণতন্ত্রের আদর্শ হতে বিচ্যুত থাকা শাসকশ্রেণি কর্তৃক সমালোচনার দ্বার বন্ধ করে বাকস্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করার দরুণ নিপীড়িত জনগন শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং তাদের দাবি আদায়ে রাজপথে নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচারী সরকার বাধ্য হয় ক্ষমতার গদি ছাড়তে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচারের

পতন হলেও জন আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে একবার অধিকার আদায় মাত্রই জনগন বারবার সে স্বাদ আস্বাদন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। নবগঠিত সরকারও জনগণের দাবি পূরণ ও ন্যায্য অধিকার প্রদানে স্থিতিশীলতা আনয়নে গ্রহণ করে জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ যা মূলত ইসলামি গণতন্ত্রেরই শিক্ষা। তাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের সহিংসতা বন্ধে ও আদর্শ গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির অনুসরণই হতে পারে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকরী হাতিয়ার।

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

অর্থ: আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম (আল-কুরআন, ৩:১৯।

আল্লাহর মনোনীত এ জীবনব্যবস্থা কেবল পূর্ণাঙ্গ নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, এতে সকল বিষয়ের নির্ভুল ও বাস্তবসম্মত সমাধান রয়েছে যা সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় সকল দেশ ও জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম-ই একমাত্র জীবনবিধান যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফলে এ জীবনব্যবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে তার জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা খুঁজে পাবে একইভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানও রাষ্ট্র পরিচালনার উত্তম সংবিধানের সন্ধান পাবে। আর এই সংবিধানের ধারা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং জনকল্যাণকামী যেকোন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য এটি একটি আদর্শ। কেননা, একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা-ই নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারে। এর প্রধান কারণ হলো, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা গণতন্ত্রকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যেখানে মুসলিম-অমুসলিম, আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সকলেই সমানাধিকার প্রাপ্ত। এ শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশরাফ-আতরাফ, মুনিব-দাস, শাসক-শাসিতের মধ্যে বিভেদ করার সুযোগ নেই। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আইনে নির্ধারিত শাস্তি হতে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলেকে ছাড় না দেয়ার দৃষ্টান্ত

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করে। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্রের রূপরেখা ও দিকনির্দেশনার বিপরীতে মানবসৃষ্ট গণতন্ত্রের রূপরেখা ও স্বরূপ যে কতটা ক্রুটিপূর্ণ তা বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচলিত অগণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যদের নিয়োগ, ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র অধিপত্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগে ক্ষমতালিপ্সুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বোপরি হৃত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্যাতিত জনগণের আন্দোলন ও বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত। মানবসৃষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এরূপ অধঃপতনের কারণ হলো, এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যাবলী কেবল কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে, যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের শাসনের যথাযথ প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সকলেই জবাবদিহি করতে ও বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য। ফলে এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথকে তরান্বিত করে। তাই বর্তমান বিশ্বে সৃষ্ট অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা-ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আলোচ্য গবেষণাপত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দমনে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

‘ইসলাম ও গণতন্ত্র’ শীর্ষক আমার এই গবেষণাপত্রটিতে বর্ণনামূলক বা পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, জার্নাল ও ইন্টারনেট হতে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ইসলাম ও গণতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র এবং প্রচলিত গণতন্ত্রে পরিচালিত রাষ্ট্রসমূহের যে সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান সঙ্কট মোকাবেলায় সহায়ক হবে তা যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনার শেষে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের পরিচয় ও উৎপত্তি

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy যা গ্রিক শব্দ Demo Kratia থেকে উদ্ভৃত। গ্রীক Demokratia শব্দটি Demos' এবং Kratia' শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট। 'Demos' শব্দের অর্থ হল 'জনগণ' এবং 'Kratia' শব্দের অর্থ হল ‘শাসন ক্ষমতা’। সুতরাং, Democracy শব্দের অর্থ, জনগণের শাসন ক্ষমতা (হক, ২০১১)।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। ১৮৬৩ সালের ১৯ শে নভেম্বর লিংকন তার দেয়া গেটিসবার্গ বক্তব্যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে 'Government of the people, by the people, for the people' অর্থ হলো-গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগনের দ্বারা ও জনগণের জন্য (হক, ২০১১)। অধ্যাপক গেটেলের মতে, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র (সাদি, ২০১০)।

মূলত আধুনিক মতে গণতন্ত্র বলতে এমন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গণতন্ত্র প্রথম উদ্ভাবিত হয় গ্রীসের এথেন্সে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। আধুনিক যুগে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে সমগ্র বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আদর্শ গণতন্ত্রের সকল বৈশিষ্ট্য এসকল দেশেও পরিলক্ষিত হয়না।

কেননা গণতন্ত্র বলতে সমাজের একটি বড় অংশকে আজও কেবল সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বচনকেই বোঝানো হয় অথচ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য নাগরিকদের সুশিক্ষা, দক্ষ নেতৃত্ব, সহনশীলতা, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা, জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে মদিনায় মহানবী (দ:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে বুঝায় যেখানে ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত ছিল (খান ও রহমান, ২০১৬)। ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বকে বুঝায় না। বরং সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর। আর এই সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষের ওপর। মানুষের রাজনৈতিক কর্মকান্ড আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবার ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে। সেখানে বিধি মোতাবেক অমুসলিম প্রজাবর্গ ও জিম্মিদেরও অধিকার নিশ্চিত হয় (তায়ের, ২০০৯)।

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তার নির্দেশিত পন্থায় জনকল্যাণে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা-ই হলো গণতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও তিনি মূলত জনগণের সেবক। তিনি তার সকল কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এবং আইনের প্রতি সার্বিক অধীনতা স্বীকার করেন। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান আইনের উর্ধ্বে নন। এমনকি জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য তিনি পার্থিব জীবনে বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। ইসলামী রাষ্ট্রে সকলে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি ভোগ করে এবং মুসলমান-অমুসলমান সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে সকল ধর্ম বর্ণের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশিশ্চতকরণে এটি একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যার সূচনা হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (দ) কর্তৃক রচিত মদিনা সনদে সকলের অধিকার সম্বলিত ধারা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।

জ্বিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ বাস্তবায়ন করা

আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন নিরংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

'আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদতের জন্য'। তাফসীর কারকগণ বলেছেন, এখানে ইবাদাতের অর্থ হল, তাওহীদ। অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ বাস্তবায়ন করার জন্য (তাফসীরে কুরতুবী, যারিয়াত: ৫৬, তাফসীরে সমরকন্দী, সূরা যারিয়াত: ৫৬)।

অতএব, আমরা বিশ্বাস, কর্ম ও কথা সবদিক থেকেই তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট। আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদের দাবি মেনে চলতে এবং তাওহীদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে আদিষ্ট। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আমলী জীবন সর্বত্রই তাওহীদের দাবি মেনে চলতে হবে এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাওহীদের দাবি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা কেউই আল্লাহর বান্দা হতে পারব না এবং আমাদের দ্বারা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি আমাদের দ্বারা অর্জিত না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভয়ানক অশুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গতানুগতিকভাবে আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু আমার ঈমান ও তাওহীদ সহীহ হচ্ছে কিনা সেটা একটিবারের জন্যও ভেবে দেখার সুযোগ হল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ও আফসোসের কথা আর কী হতে পারে!

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার উপর ঈমানের শুদ্ধতা নির্ভর করে। তাই তাওহীদকে জানতে হবে, তাওহীদকে মানতে হবে। যার দ্বারা তাওহীদের কোনো দাবিই আদায় হয় না, যে অহরহ তাওহীদ পরিপন্থি কাজ করে বেড়ায়, সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও আসলে সে মুসলিম নয়, সে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাযসহ তাহাজ্জুদ পড়লেও মুমিন বলে গণ্য হবে না। তাই তাওহীদ জানা ও মানা একটি অপরিহার্য বিষয়। তাওহীদের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি কোনোরূপ অবহেলা করার সুযোগ নেই। তাই তাওহীদকে জানতে হবে, তাওহীদকে মানতে হবে এবং ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে সর্বত্র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

তাওহীদের অর্থ হল : আল্লাহ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় হকসহ পৃথক করা, আল্লাহ তাআলার গুণাগুণগুলো আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারণ করা, অন্য কাউকে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ বা কর্মের মধ্যে শরীক না করা।

আহলে ইলমগণ তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন-

১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ :

অর্থাৎ রব হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ/ একত্ববাদকে স্বীকার করা। রুবুবিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। যেমন, আসমান-যমীনের অধিপতী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেয়া। রাযেক, খালেক, মালেক, জীবনদান-কারী, মৃত্যুদানকারী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করে নেয়া; এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। অতীতের অনেক কাফের সম্প্রদায়ও তাওহীদের এই প্রকারকে স্বীকার করত। তখনকার মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকারের তাওহীদকে স্বীকার করত। যেমন হরশাদ হচ্ছে-

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?' (সূরা ইউসুফ: ৩১)

বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করা।

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ :

অর্থাৎ ইলাহ বা ইবাদাতের যোগ্য ও হুকুমদাতা হিসাবে শুধু আল্লাহকে স্বীকার করা। ইবাদাতমূলক যত কর্ম-কাণ্ড রয়েছে সব একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা, কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা এবং আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা। হুকুমদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানা, আল্লাহর হুকুমের সাংঘর্ষিক অন্য কারো হুকুম না মানা। যেমন: দুআ করতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ করা, ভয় শুধু আল্লাহকেই পাওয়া, আশা শুধু আল্লাহ তাআলার দরবারেই করা। হুকুম ও হুকুমাত শুধু আল্লাহরই মানা। ইরশাদ হচ্ছে-

يأَيُّهَا النَّاس ُاعْبُدُوا رَبَّكُم ُالَّذِى خَلَقَكُم ْو َالَّذِين َمِن ْقَبْلِكُم ْلَعَلَّكُم ْتَتَّقُون َ

'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঐ প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (আল বাকারা: ২১)

মূলতঃ এই প্রকারের তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে আ. দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ْقَبْلِك َمِن ْرَّسُول ٍإِلَّا نُوحِي إِلَيْه ِأَنَّه ُلَا إِلَه َإِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون ِ

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।' (আল-আম্বিয়া:২৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَد ْبَعَثْنَا فِي كُل ِّأُمَّة ٍرَّسُولًا أَن ِاعْبُدُوا اللَّه َوَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت َ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত বর্জন কর।' (নাহল: ৬)

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত :

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিশেষ নামসমূহ এবং গুণসমূহ যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। এখানেও দু'টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

১. কুরআন-সুন্নাহর ভিতর আল্লাহর যত আসমা ও সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে তা সব যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং স্বীকার করা।
২. সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ কোনো কিছু বা কেউ আল্লাহ তাআলার মত হতে পারে- এটাকে অস্বীকার করা। "কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর অন্তর, চোখ, হাত ইত্যাদি মর্মে যেসব আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলার সিফাত। আল্লাহ তাআলার শান মোতাবেক এই সিফাতগুলো তার জন্য সাব্যস্ত।"

কালিমায়ে তাওহীদ এই তিন প্রকারের তাওহীদের সমন্বয়ের নাম। কেউ কালিমা পড়ে, নিজেকে মুসলিম দাবী করে কিন্তু এই তিন প্রকারের তাওহীদের কোনো এক প্রকারকে অস্বীকার করে, অথবা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে মূলত মুসলিম নয়, মুমিন নয়, বরং সে কাফের, মুশরিক। তার ঈমান তাকে আখেরাতে মুক্তি দিবে না। দুনিয়াতেও সে ঐ আধুরা ঈমানের কারণে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কালিমার রুকন

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মধ্যে দুইটি বিষয় রয়েছে। এক. লা-ইলাহা (কোনো উপাস্য নেই) বলে আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের সকলকে অস্বীকার করা হয়েছে। দুই. ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত) দ্বারা যাবতীয় ইবাদাতকে শুধু আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে। অস্বীকার করা এবং স্বীকার করা এই দুইটি হল কালিমার রুকন। অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়, এমনিভাবে স্বীকার ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথাটাই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে আরো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত হচ্ছে,

لَا إِكْرَاه فِي الدِّين قَد تَبَيَّن الرُّشْد مِن الْغَي فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت و
يُؤْمِن بِاللَّه فَقَد اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة الْوُثْقَى لَا انفِصَام لَهَا وَاللَّه سَمِيع عَلِيمٌ

'দ্বীন কবুলের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করবে এমন সুদৃঢ় হাতল যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।' (বাকারা: ২৫৬)

পূর্বে বর্ণিত সূরা নাহল এর ৩৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন। সূরা যুমার এর ১৭নং আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে,

وَالَّذِين اجْتَنَبُوا الطَّاغُوت أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُم الْبُشْرَى فَبَشِّر عِبَادِ

'যারা তাগুতের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব, আপনি আমার বান্দাকে সুসংবাদ দিন।'
তাওহীদের এই প্রকারই তখনকার মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল। আর এই তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।
কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা মূলত এই তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।
এসব আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হল, সহীহ ঈমান গ্রহণের জন্য তাগুতের ইবাদতকে অস্বীকার করে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদাতকে স্বীকার করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহর

ইবাদত করে কিন্তু তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তাহলে সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না। এখন প্রশ্ন হল 'তাগুত' কী? তাগুত কাকে বলে? তাগুত এবং তাগুতের ইবাদাত অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কী বুঝিয়েছেন?

তাগুতের সংজ্ঞা

ইমাম তবারী (রহ.) তাগুতের সংজ্ঞায় বলেন-

'আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হল: সেই হল তাগুত যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে তারই উপসনা করা হয়, হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু। [তাফসীরে তবারী, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ২১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাগুতের ব্যাখ্যায় বলেন:

তাগুত হল: উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবরদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা হয় (এবং সে এর উপর রাজি থাকে)।

সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হল সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের (বিধানের) প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার আনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য। [ই'লামুল মুআক্কিয়ীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০]

তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করা হয়, আল্লাহ তাআলা ব্যতিরেকে যার উপাসনা করা হয়, আল্লাহর অবাধ্যতায় যাকে মান্য করা হয় সেই তাগুত। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই অর্থে তাগুত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِين يَزْعُمُون أَنَّهُم آمَنُوا بِمَا أُنْزِل إِلَيْك وَمَا أُنْزِل مِن قَبْلِك يُرِيدُون أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وَقَد أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِه وَيُرِيد الشَّيْطَن أَن يُضِلَّهُم ضَلَلًا بَعِيدًا

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে।' (সূরা-নিসা, আয়াত: ৬০)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:
'এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর যা অবর্তীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায়। এ আয়াতের সাবাবে নুযুলে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইয়াহুদী পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। ইয়াহুদী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ। আনসারী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা'আব বিন আশরাফ। আরো বলা হয়ে থাকে: আয়াতটি অবর্তীণ হয়েছে এমন একদল মুনাফিকের ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহের করতো আর জাহিলিয়াতের বিধান দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষণ করতো। কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত আয়তটি এ ধরনের সকল ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছে, যে কুরআন সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটি ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রর্থনা করে। [আর যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে। এ আয়াতে তাগুত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড: ২,পৃষ্ঠা: ৩৪৬]
আয়াতটি স্পষ্ট করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পিছনে ফেলে ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে সেই হলো তাগুত। আর যারা এখানেই ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে। তার বিধান না মেনে আল্লাহ তাআলার বিধান মানলে শাস্তি প্রদান করে।
মোটকথা, তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়, আল্লাহর বিপরীতে যাদেরকে মান্য করা হয় তারাই তাগুত। যেমন: মূর্তি, কাহেন (ভবিষ্যৎবক্তা), দরবারী আলেম যে নিজের ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে

ফেলে এবং এমন সব শাসক ও বিচারক যারা কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিপরীত বিচার-ফায়সালা করে। মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী আইন মানতে বাধ্য করে। সূদের প্রচলন ঘটায়। মদ ও যিনার লাইসেন্স দেয়। কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। বরং কুরআন-সুন্নাহর আইনকে মধ্যযুগীয় বর্বর আইন বলে তামাশা করে। এদের প্রত্যেকে তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। সহীহ ঈমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা শর্ত তাই উপরিউক্ত সব ধরনের তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করতে হবে, তাদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যা দ্বারা বুঝে আসে যে ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে যেমন ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ.। ইরশাদ হচ্ছে:

قَد كَانَت لَكُم أُسْوَة حَسَنَة فِي إِبْرَاهِيم وَالَّذِين مَعَة إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِم إِنَّا بُرَا
مِنْكُم و مِمَّا تَعْبُدُون مِن دُون اللَّه كَفَرْنَا بِكُم وَبَدَا بَيْنَنَا و بَيْنَكُم الْعَدَاوَة
و الْبَغْضَاء اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَة] الممتحنة[:

'তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।' (মুমতাহিনা : ৪)

তাগুত বর্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না।

দ্বীন-ইসলামের হাকীকত

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ-ই হল দ্বীন-ইসলামের হাকীকত। সব প্রকারের তাগুতকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করাই এই তাওহীদের শিক্ষা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাওহীদেরই প্রচার করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাগুতকে বর্জন করে, জাহেলী শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের ঘোষণার কারণেই মূলত তখনকার মক্কার মুশরিকরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা রাযি. এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। আজও যদি কেউ কালিমাকে ঐ অর্থে বুঝে যে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বুঝে ছিলেন, ঐ তাওহীদ গ্রহণ করে যে তাওহীদ সাহাবা রাযি. গ্রহণ করে ছিলেন, তাহলে তার হালতও ঠিক তেমনি হবে যেমন হয়ে ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর হালত।

শিরকঃ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

তাওহীদের জ্ঞানের পাশাপাশি তাওহীদের বিপরীত বিষয় শিরক এর বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা রাখা আবশ্যক। শিরকের সরল সংজ্ঞা হল, গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তাআলার কোনো বৈশিষ্টের মধ্যে শরীক করা।

শিরক প্রধানত দুই প্রকার : ১. শিরকে আকবার ২. শিরকে আসগার।

১. শিরকে আকবার: এমন শিরক যে শিরককারীকে আল্লাহ তাআলা তাওবা ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং সে যদি শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে রেখে দিবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وقال تعالى : إِنَّه ُمَن ْيُشْرِك ْبِاللَّهِ فَقَد ْحَرَّم َاللَّه ُعَلَيْهِ الْجَنَّة َوَمَأْوِيه ُالنَّارُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না, তবে শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন।' (সরা নিসা:৪৮) আরো ইরশাদ

হচ্ছে, 'যে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করবে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম।' (মায়েদা: ৭২)

শিরকে আকবার মৌলিকভাবে চার প্রকার:

শিরকে আকবারের প্রথম প্রকার হল, দুআর মধ্যে শিরক করা:
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে (যেমন, মাজার, পীর ইত্যাদির কাছে) দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

'যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য এমন উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।' (আল মুমিনূন:১১৭)
অতএব বুঝা গেল যে- শাইখ, উস্তাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না।

শিরকে আকবারের দ্বিতীয় প্রকার হল, আনুগত্যের মধ্যে শিরক করা:
অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর, ধর্মগুরু, শাসক, উলামায়েসূ বা এজাতীয় অন্য কাউকে মান্য করা। কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের পীর, শায়েখ, শাসক বা ধর্মগুরুর আনুগত্য করত ঐ হুকুম পালন না করা। যেমন কারো কাছে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হল যে, বর্তমানে তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তার পীর/শাইখ, উস্তাদ বা শাসক তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে এবং তাকে জিহাদের পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করছে। এমতাবস্থায় এই লোকটি যদি পীর/শাইখ বা শাসকের কথামত জিহাদ পরিত্যাগ করে, জিহাদের পথে অগ্রসর না হয়, তাহলে সে আল্লাহর হুকুমের উপর পীর, শাইখ বা শাসকের কথাকে প্রাধান্য দিল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করল। তখন এই ব্যক্তির দ্বারা আনুগত্যের মধ্যকার শিরক পাওয়া গেল। ফলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হল। আল্লাহ তাআলা খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলছেন,

اتخَذُوا أَحْبَارَهُم ْوَرُهْبَانَهُم ْأَرْبَابًا مِن ْدُون ِالله ِوَالْمَسِيح َابْن َمَرْيَم َوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَه َإِلَّا هُو َسُبْحَانَه ُعَمَّا يُشْرِكُون.َ

'তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল শুধু মাত্র এক ইলাহর ইবাদতের জন্য, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তারা যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র। [সূরা তাওবা: ৩১]

উপরোক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি বিষয় বুঝে আসে না যে কী ভাবে- “তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে।" অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করত না ও তাদের ইবাদতও করত না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করত ও তাঁরই ইবাদত করত।

হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন:

عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.

'আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: "তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে" আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম

করেছেন তারা তা হালাল করত আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে? আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই হত। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। [তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খণ্ড ৪৭১ নম্বর হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০, সনদ: হাসান সহীহ)।

সূরা আহযাবে ইরশাদ হচ্ছে,

يَوْم َتُقَلَّب ُوُجُوهُهُم ْفِي النَّار ِيَقُولُون َيَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّه َوَأَطَعْنَا الرَّسُولا . وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا . رَبَّنَا آتِهِم ْضِعْفَيْن ِمِن َالْعَذَاب ِ وَالْعَنْهُم ْلَعْنًا كَبِيرًا.

'যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।' (সূরা আহযাব: ৬৬-৬৮)

সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের কথা মান্য করা হারাম। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুস্থ বুদ্ধি দিয়েছেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও দিয়েছেন, আর চিন্তা-ফিকির করার হুকুমও দিয়েছেন, তথাপি স্পষ্টরূপে আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর/ শাইখের আনুগত্য না করে নিজের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে। নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। শাইখ, উস্তাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ কখনো কাম্য নয়। তারা কেউ শরীয়ত প্রণেতা নয় যে, তারা যা বলবে তা শরীয়তের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মানতে হবে। তাকওয়া হাসিলের জন্য আল্লাহ তায়ালা সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন, তাই অবশ্যই সাদেকীনদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে। আল কুরআনে সাদেকীনদের পরিচয় সম্বলিত যে কয়টি আয়াত আছে সেগুলোকে সংক্ষেপ করলে পাওয়া যায়, যারা সাদেকীন-

১. তারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন।
২. তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান রাখে এবং সাথে সাথে ঐ সব বিষয়েও ঈমান রাখে যেসব বিষয়ে ঈমান আনয়ন না করলে মুমিন হওয়া যায় না, যেমন: আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, রাসূলগণ ইত্যাদি।
৩. তারা শক্ত ঈমানদার; ঈমান আনয়নের পর তারা সমান্যতম সন্দেহ পোষণ করেন না।
৪. তারা আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে জিহাদ করেন।
৫. তারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেন।
৬. তারা কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর যুদ্ধের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক হালতের উপর ধৈর্য ধারণ করেন।
৭. তারা দ্বীনের জন্য এত বেশি কুরবানী পেশ করেন যে, প্রয়োজনে নিজের দেশ, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় চলে যান, যেখানে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে পারবেন।
৮. তারা আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির, কৃতদাসের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং এতীম-মিসকীনদেরকে নিজের ধন-সম্পদ দান করেন।
৯. সালাত কায়েম করেন। যাকাত প্রদান করেন।
১০. অভাবে, রোগে, শোকে ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করেন।

সাদেকীনদের পরিচয় সম্বলিত আয়াতসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই জিহাদের গুণটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্যান্য গুণগুলোর বেলায় হয়নি। জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকা অবস্থাতেও কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জান-মাল দ্বারা জিহাদে শরীক হতে হবে, অন্যথায় ঈমানের পূর্ণতা অর্জন হবে না এবং সাদেকীনদের অন্তর্ভুক্তও হওয়া যাবে না। কেননা কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন থাকে। তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বিশ্ব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় যদি পীর-মাশায়েখগণ জিহাদে শরীক না হন, জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করেন, যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যের সবক হাসিল না করেন, কিংবা অন্তত: যারা জিহাদের ময়দানে কাজ করছে, তাদের পক্ষে ফাতওয়া দিয়ে সমর্থন না যোগান এবং সাধ্যানুযায়ী মালী সহায়তা না করেন, তাহলে তারা সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। কোনো ফরয আমল ছেড়ে দেয়া অবশ্যই কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহকারী

এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, বিশেষত যার ঐ গুনাহ সম্পর্কে কোনো অনুভূতিই নাই এবং সে ঐ গুনাহকে গুনাহ-ই মনে করে না, এরূপ ব্যক্তি কোনোভাবেই সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। কবীরা গুনাহ থেকে খালেস তাওবা করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা হতে পারেন না।

সাদেকীনের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবে যেসব ব্যক্তিবর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে সাদেকীন হওয়ার জন্য যেসব সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সিফাত বা গুণাগুণ যাদের ভিতর পাওয়া যাবে তারাই সাদেকীন। বর্তমান যমানায় ঐ সব মুত্তাকী, পরহেযগার মুজাহিদ উলামাগণ সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত যারা পৃথীবির বিভিন্ন ফ্রন্টে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ জান-মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। কুফুরী শক্তিকে ধ্বংস করে পৃথিবীময় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলান্দ করার জন্য নিজের মান-সম্মান, ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ সব কিছু ত্যাগ করে মরুভূমি, বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতে ফকীরানা জীবন-যাপন করছেন। শত্রুর উপর একের পর এক আঘাত হেনে শত্রুর দম্ভকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছেন; কুফরের ঝাণ্ডাকে পদদলিত করছেন, উম্মাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যেদিক থেকেই মজলুমানের আহ! ধ্বনি ভেসে আসছে সেদিকেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন, তাঁরাই হলেন প্রকৃত সাদেকীন। তাঁদের সংসর্গ অবলম্বনের আদেশই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তাদের সুহবতে থাকলেই অতিঅল্প সময়ে তাকওয়া, ইখলাসসহ আত্মশুদ্ধির অন্যান্য বিষয়গুলো খুব সহজে হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. শিরকে আকবারের তৃতীয় প্রকার হল, শিরকুল মুহাব্বাহ: অর্থাৎ মুহাব্বতের মধ্যে শিরক করা।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِن النَّاس مَن يَتَّخِذ مِن دُون اللَّه أَندَادا يُحِبُّونَهُم كَحُب اللَّه وَالَّذِين آمَنُوا
أَشَد حُبًّا لِلهِ

'আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহকে রেখে অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালবাসে।' (আল বাকারা: ১৬৫)

মুহাব্বত চার ধরনের:

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, মুহাব্বত চার ধরনের। প্রত্যেক প্রকারের পার্থক্য জানা উচিত। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা রয়েছে।

ক. আল্লাহকে মুহাব্বত করা। (শুধু আল্লাহকে মুহাব্বত মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, মুশরিকীন এবং ইয়াহুদী-নাসারাগণও আল্লাহকে মুহাব্বত করে, কিন্তু তাদের এই মুহাব্বত তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।)

খ. আল্লাহ তাআলা যা কিছু ভালবাসেন তা ভালবাসা, তিনি যা কিছু পছন্দ করেন তা পছন্দ করা। এই প্রকারের মুহাব্বতই মানুষকে ইসলামে দাখেল করে। আর এই মুহাব্বতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফেরে পরিণত করে।

গ. আল্লাহর জন্য ভালবাসা। দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা/ মুহাব্বত তৈরি হলে তৃতীয় প্রকার এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। এই প্রকারের মুহাব্বত দ্বিতীয় প্রকারের মুহাব্বতের আবশ্যকীয় অংশ।

ঘ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালবাসা। আল্লাহকে যেমন ভালবাসা হয় অন্য কাউকে ঠিক তেমন বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা। এটাই হল শিরকী মুহাব্বত। যেকেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ভালবাসবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, তখনকার মুশরিকরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসত। আল্লাহ তাআলা এই ভালবাসার কারণে তাদেরকে মুশরিক বলেছেন।

শিরকে আকবারের ৪র্থ প্রকার হল নিয়তের মধ্যে শিরক করা:

অর্থাৎ কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি আশা করা; শুধু অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমলটা করা। এই প্রকারের শিরক কারো থেকে পাওয়া গেলে তার ঈমান-আমল গ্রহণ করা হবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَن ِوَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ ُمَا لَه ُرِئَاء النَّاس ِ وَلَا يُؤْمِن ُبِاللَّه ِوَالْيَوْم ِالْآخِر ِفَمَثَلُه ُكَمَثَل ِصَفْوَان ٍعَلَيْه ِتُرَاب ٌفَأَصَابَه ُ وَابِل ٌفَتَرَكَه ُصَلْدًا لا يَقْدِرُون َعَلَى شَيْء ٍمِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّه ُلَا يَهْدِي الْقَوْم َالْكَافِرِين.َ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর

উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।' (আল বাকারা: ২৬৪)

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক আয়াতে, একটিনষ্ঠভাবে শুধু তারই বন্দেগী করতে বলেছেন। আর সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 'শুরাকাদের মধ্যে আমি শিরক থেকে সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তাহলে আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করব।' (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-২৯৮৫, আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ পৃ.৮)

নিয়তের মধ্যে শিরকের অনেক স্তর ও প্রকার আছে। এর মধ্যে কিছু প্রকার আছে শুধু শিরকে আসগার তথা রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন: আমল শুরু করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু শুরু করার পর লোক দেখানো ভাব চলে আসল, তাহলে এটা হবে রিয়া। আর কিছু প্রকার আছে যা বৈধ। যেমন: কেউ রোযা রাখল সাওয়াব অর্জন এবং সুস্থতা ধরে রাখার জন্য। আর যে প্রকারটি শিরকে আকবার তথা যার কারণে মুমিন ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হয় তাহল, কোনো একটি আমল শুরু করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা এবং উক্ত আমল দ্বারা বিন্দু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা না করা।

ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

ঈমানের সংজ্ঞাঃ

ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী (রহ.) বলেন:

'ইমাম মালেক, শাফিঈ, আওযাঈ, ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) এবং সকল মুহাদ্দিস, মদিনাবাসিগণ, জাহিরীগণ ও অনেক তর্কশাস্ত্রবিদের মত হল, 'ঈমান হল অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলের নাম।' তবে অনেকে ইমাম ত্বহাবী (রহ.) এর মত গ্রহণ করেছেন যে, 'ঈমান হল, আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তি।' আর কারো কারো মত হল, 'মৌখিক স্বীকারোক্তি একটি অতিরিক্ত রুকন;

মৌলিক নয়।' এই মতটি গ্রহণ করেছেন, আবূ মানসুর আল-মাতুরিদী (রহ.)। তিনি এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।'

তাঁর কথার মর্মার্থ হলো এই যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল ঈমানের বিশ্বাসকে যা সামর্থ্য থাকার শর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমলকে আবশ্যক করে। ('সামর্থ্য থাকার শর্তে' বলা হয়েছে, কারণ যার মৌখিক স্বীকারোক্তির সামর্থ্য নেই যেমন বোবা, তার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত নয়।) যদি কেউ অন্তর দ্বারা জানে আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, কিন্তু এই জ্ঞান তাঁকে আল্লাহর সামনে মৌখিকভাবে ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, তাহলে এটিকে ঈমান বলা হয় না, কেননা ঈমান বলা হয় গভীর ও সুদৃঢ় বিশ্বাসকে। শুধুমাত্র কোন বিষয় জানা থাকাকে নয়। আর কারো যদি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে তাঁকে মানতে বাধ্য। ফলে তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তার বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই। যেমন, কোন এক ব্যক্তি মূর্তির সামনে স্বেচ্ছায় সিজদাহ করল। আর ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতে, লোকটি কাফের হয়ে গেছে কেননা তার অন্তরে ঈমান নেই। যদি ঈমান থাকত সে কখনই মূর্তিকে সিজদাহ করত না। মূর্তির সামনে সিজদাই প্রমাণ করে তাঁর অন্তর ঈমান শূন্য। (শরহু আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী)

ঈমানের অর্থ যদি হয় শুধু অন্তর দ্বারা জানা, তাহলে আবু তালিব মুমিন হবে না কেন? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাস্তবেই আল্লাহর রাসূল এটি সে ভালোভাবেই জানত এবং বুঝত, কিন্তু প্রবৃত্তি ও বংশীয় অহমিকার কারণে সে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি, তাই সে কাফের বলেই গণ্য হবে। দ্বীনের এত উপকার করা স্বত্ত্বেও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে, ঐ সময় অনেক ইয়াহুদি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য, তাঁর আনীত বিধানাবলি সত্য এটা ভালোভাবেই জানত। তারা নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের পরামর্শ দিত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেরা তাকে মেনে নেয়নি। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন: "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা নিজ সন্তানদের ন্যায় তাঁকে চেনে কিন্তু তাদের একটি দল জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করে।" তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসাবে সেভাবে চিনত যেভাবে নিজ সন্তানদেরকে চিনে। তথাপি তারা মুমিন হতে পারেনি। বরং তারা কাফের। চির জাহান্নামী।

ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণঃ

ঈমান ভঙ্গের কয়েকটি মৌলিক কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল:

1. আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। যেমন: আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা, মাজারে গিয়ে মাজারওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া।

2. আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম স্থির করা। যেমন: নিজে সরাসরি কোনো কিছু আল্লাহর দরবারে না চেয়ে পীরের মাধ্যম ধরে চাওয়া। একথা মনে করা যে, নিজে চাইলে পাওয়া যাবে না, পীর চেয়ে দিলে পাওয়া যাবে।

3. কাফের-মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা, অথবা তাদের কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ করা বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা। যেমন, এমন আকীদা পোষণ করা যে, বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করেও জান্নাতে যাওয়া যাবে।

4. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনীত সংবিধানের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা কিংবা অন্য কোনো সংবিধানকে ইসলামের সংবিধান থেকে উত্তম মনে করা। যেমন: বর্তমান যুগে ইসলামের বিধানকে অচল মনে করা। ইসলামের বিধানকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করা, আর মানব রচিত সংবিধানকে উত্তম ও যুগোপযোগী মনে করা।

5. ইসলামের কোনো বিধানকে আন্তরিকভাবে অপছন্দ করা যদিও বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর আমল করা হোক না কেন। যেমন, পর্দার হুকুমকে অপছন্দ করা কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির একাধিক বিবাহকে অপছন্দ করা। এমনিভাবে জিহাদকে অপছন্দ করা। জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

6. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা। যেমন: দাড়ি, টুপি বা মেসওয়াক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

7. যাদু করা বা কুফুরী কালাম করা।

8. ইসলামের বিপক্ষে বা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করা। অতএব, যে বা যারা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করবে তারা কাফের হয়ে যাবে।

9. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা। যেমন, মারেফতের ধোঁয়া তুলে নিজেকে ইসলামের হুকুম আহকামের উর্ধ্বে মনে করা। বাতেনীভাবে নামায-রোযা আদায়ের কথা বলা।

10. দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা, দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো শিখতে না চাওয়া, দ্বীনের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাওয়া। দ্বীনের হুকুম-আহকামকে বোঝা মনে করা। মৌলিকভাবে দ্বীনকে অপছন্দ করা।

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণ এমন, যার একটি যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে; সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায় তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। ঐ হালতে মৃত্যু হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।
অজ্ঞতার কারণে যদি কারো থেকে এ জাতীয় কোনো অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্রুত তাওবা করে নতুন করে কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হবে। (প্রমাণপঞ্জী: আকীদাতুত তহাবী, শরহে আকাইদ, আকীদাতুল ওয়াসেভিয়্যাহ, কিতাবুত তাওহীদ, কেফায়াতুল মুস্তাযীদ শরহু কিতাবিজ তাওহীদ)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদা এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১. আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের আনুগত্যকে জরুরী মনে করে। মুসলিম শাসক যদি ফাসেকও হয় তথাপি তার ইমামতিতে নামায এবং তার নেতৃত্বে জিহাদকে জরুরী মনে করে।

2. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কাফের ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক নিযুক্ত করা বৈধ মনে করে না। কোনো মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করার পর যদি সে কাফের হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করে একজন আদেল তথা ন্যায়পরায়ন, মুত্তাকী-পরহেযগার মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব মনে করে। তাৎক্ষণিকভাবে কাফের শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, জিহাদের প্রস্তুতিকে জরুরী জ্ঞান করে।

3. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর এমন একটি আকীদা যা আজ মুসলিমরা ভুলে যেতে বসেছে। মুসলিমের বন্ধুত্বের ভিত্তি হল, ঈমান। যে বে-ঈমান, কাফের এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী তার সাথে মুসলিমের কোনোরূপ বন্ধুত্ব হতে পারে না। বরং কাফেরদের প্রতি প্রকৃত মুসলিমের চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে এ মর্মে আদেশ জারি করেছেন, যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, যদি কেউ মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। কেউ যদি কাফেরদের সাথে চুক্তি বা বন্ধুত্বের কারণে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে; মুসলিমকে গ্রেফতার করতে কিংবা হত্যা করতে কাফেরদেরকে সাহায্য করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

কোন মুসলিম দেশের শাসকের কাফের হওয়ার কারণ

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে কোন মুসলিম দেশের শাসকদের কাফের হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

- ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা, এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে।

- কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে ।

- কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের অনুসরণ করার কারণে।

- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি করার কারণে।

- কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার কারণে।

- আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন, সূদ, যিনা, মদপান) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে।

- আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন জিহাদ, ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ ইত্যাদি) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করার কারণে।

- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করার কারণে।

- মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে।

- পবিত্র জিহাদের হুকুমকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করার কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে।

- মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃণা ভরে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ট্যাগ দেয়ার কারণে।

- সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের জন্য জিহাদ করতে চায় তাদেরকে আটক করে নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে।

- মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করার অপরাধে।

- জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করা এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া ও বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করার কারণে তারা কাফের।

মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ কী কী কারণে কাফের তার কারণগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াস থেকে দলীল পেশ করা হলো।

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে কুরআন থেকে দলীল

দলীল নং- ১

يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَاء (بَعْض
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُم فَإِنَّه مِنْهُم إِن اللَّه لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالِمِين.

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়েদা: ৫১]

ইমাম তবারী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যতিরেকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তারা বিপরীত সবকিছুর ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। সুতরাং দুজনের হুকুম একই হবে। [তাফসীরুত তবারী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা: ২৭৭]

আল্লামা শাওকানী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভুক্ত হবে। এটি একটি কঠিন হুশিয়ারী কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক করে এবং একটি চূড়ান্ত সীমারেখা যার পর আর কোন সীমা বাকী থাকে না।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" আয়াতের এই অংশটি পূর্বের অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ তাদের কুফরের মাঝে পতিত হওয়ার কারণ হল, যে নিজের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন না যা কুফরকে অবধারিত করে (অর্থাৎ তাকে কুফরী থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন না)। যেমন ঐ ব্যক্তি, যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খণ্ড:২ পৃষ্ঠা: ৭৩]

আল্লামা কুরতুবী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-
"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে"- অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে। "নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন"- আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের যেই হুকুম তারও ঐ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলিমের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ভালোবেসে ছিল, সে হল ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৬, পৃষ্ঠা: ২১৭]

আর পরষ্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা। তথ্য দিয়ে, অস্ত্র যুগিয়ে অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা।
উলামাগণ বলেন, "যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করা। [আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্ঠা: ২১]
এই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে তথ্য, অস্ত্র, সৈন্য, বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে, তারা কাফের হয়ে যাবে।

দলীল নং- ২

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধান দানকারী?'
(সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৫০)
ইমাম তবারী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেন-
'আল্লাহ তাআলা বলছেন: এ সকল ইয়াহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা আপনার ফায়সালার

ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি "জাহিলিয়্যাতের বিধান" কামনা করে? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা করেছেন তার সত্যতা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ক যার বিপরীত সব কিছু নাহক্ক।

অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভর্ৎসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কর্মকে জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলছেন: ওরে ইয়াহুদ! যারা স্বীকার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার চেয়ে আর কে আছে উত্তম আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী, যারা তার রুবুবিয়্যাতকে বিধান দানকারী। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব আছেন, তোমরা তার তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী হতে পারে?! [তাফসীরে তবারী, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩৯৪]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন:

এই কথার মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বর্ণনা ও তার কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, মানুষদের জন্য তৈরি মানুষের বিধানকে। কেননা, মানুষ যখন মানুষের তৈরি বিধান দ্বারা শাসিত হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দাসত্বকে বর্জন করে মানুষের দাসত্ব করা হয়। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে প্রত্যখ্যান করা হয় এবং প্রত্যাখ্যানের পর তার মোকাবেলায় কতেক মানুষের উলুহিয়্যাতকে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমার্পণ করা হয়।

এই আয়াতের আলোকে বুঝে আসে, জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম নয়। জাহিলিয়্যাত হল, এক বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য। মানুষ যে সময়ে বা যে স্থানেই অবস্থান করুক, হয়ত সে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, [তার কতেক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত] তা গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণ ভাবে তার সামনে আত্মসমার্পণ করবে। তাহলেই তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে। নয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে (যে কোন অবস্থাতেই করুক না কেন) এবং তা

গ্রহণ করে নেবে, তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়াহ দ্বারা তারা বিচার ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের অনুসারী বলা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান কামনা করে না, সেই জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে। যে আল্লাহর শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে সেই জাহিলিয়্যাতের শরিয়াহকে গ্রহণ করে ও তাতে জীবন যাপন করে। [তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৪]

তিনি আরো বলেন-

'হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাত। হয়ত ঈমান নয়ত কুফর। হয়ত আল্লাহর হুকুম নয়ত জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধার দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচার প্রর্থীরা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়।' [তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যখ্যায় তাতারীদের নিয়ে আলোচনা করেন। তাতার জনগোষ্ঠি ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন:

....চেঙ্গিস খান "ইয়াসিক" নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হল ইসলামী, নাসরানি, ইয়াহুদীবাদসহ বিভিন্ন শরীয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে। এবং কম হোক বেশী হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ১৩১]

দলীল নং-৩

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابًا مِن دُون اللَّهِ وَالْمَسِيح ابْن مَرْيَم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَه إِلَّا هُو سُبْحَانَه عَمَّا يُشْرِكُون(

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তারা যে অংশীদার স্থির করে, তা হতে তিনি পবিত্র”। (সূরা তাওবা: ৩১)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, কিভাবে 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে' কারণ, বাহ্যত তারা তো তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না; বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করতো এবং তাঁরই ইবাদত করতো।

এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস শরীফে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু: ২৫৬হি.) 'আত-তারীখুল কাবীর' এ বর্ণনা করেন-

"আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ'র এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত।" (আত-তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী, ৭ম খণ্ড: ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৫০৯৩; আল-মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২, ২১৮-২১৯; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০)

এই হাদীস থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পাদ্রী ও সংসারবিরাগীরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা

রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো, কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদের বিধান গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হুযায়ফা রাযি.-এর ব্যাখ্যাঃ

"আবুল বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর বাণী اتخذوا أحبارهم সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তর দিলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা করতো না, কিন্তু পাদ্রীরা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করতো তারাও তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো, তারাও তা হারাম ধরে নিত। এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া।" (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা:

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্ করতে আদেশ করতো না; বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের আনুগত্য করতো। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।" (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১)

ইমাম তাবারী রহ. (মৃত্যু: ৩১০হি.)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম তাবারী রহ. ব্যাখ্যায় বলেন-

"অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে মাননীয় সর্দার হিসেবে গ্রহণ করেছে।আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে বিষয়কে তারা হালাল করত, এরা তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করত, এরাও তাকে হারাম ধরে নিত।" (তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২০৯)

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) এর ব্যাখ্যাঃ

"হালাল বা হারামকরণ সকল মাসলাহাত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত সত্তাব্যতীত অন্য কারো থেকে হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করেছে এবং আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হালাল-হারাম ছেড়ে দিয়ে তাদের হারাম-হালালকে গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে তারা (যেন) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, তাদের থেকে হালাল-হারাম গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।" (আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো তা হল, ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো। তারা যা অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো। শরীয়তের বিধান ছেড়ে তারা ধর্মগুরুদের আনুগত্য করতো। একর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী উভয় শ্রেণিকেই কাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

ধর্মগুরুরা কাফের এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হালালকে অবৈধ আর হারামকে বৈধ করেছে। অথচ কোন কিছুকে বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

'বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারোও ইবাদত করো না।' (সূরা ইউসূফ: ৪০)

কাজেই যারা নিজেরাই বিধান দিতে শুরু করেছে, আল্লাহর হালালকে অবৈধ কিংবা হারামকে বৈধ করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে নিজেদেরকে শরীক দাবি করেছে। কাজেই তারা কাফের।

আর অনুসারীরা কাফের এ হিসেবে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের দেয়া বিধান গ্রহণ করেছে। যেমন আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার করার কথা তেমন আনুগত্য তারা ধর্মগুরুদের করেছে। আল্লাহ ও তাঁর শরীয়ত বাদ দিয়ে ধর্মগুরু

এবং তাদের দেয়া বিধানের এই চূড়ান্ত আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহর বিপরীতে ধর্মগুরুদের চূড়ান্ত আনুগত্য করার দ্বারা তারা মূলত তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাদেরকে আহবার ও রুহবানদের আবেদ সাব্যস্ত করেছেন।

মূলত এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাসারাদের দুইপ্রকার কুফরের বিবরণ দিয়েছেন।

1. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা এবং তার ইবাদত করা।

2. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।

তাদের ধর্মগুরুরা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে মৌখিকভাবে না হলেও কর্মগতভাবে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করেছিল। আর সাধারণ জনগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের অনুসরণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে এ দু'শ্রেণি দুইপ্রকার কুফরে লিপ্ত হয়ে কাফের হয়ে গিয়েছিল।

দলীল নং-৪

عَامًا وَيُحَرِّمُونَه ُعَامًا لِيُوَاطِئُوا إِنَّمَا النَّسِيء ُزِيَادَة ٌفِي الْكُفْر ِيُضَل ُّبِه ِالَّذِين َ
كَفَرُوا يُحِلُّونَه ُعِدَّة َمَا حَرَّم َالله ُفَيُحِلوا مَا حَرَّم َالله ُزَيَّن َلَهُم ْسُوء ُأَعْمَالِهِم ْ
وَالله ُلا يَهْدِي الْقَوْم َ
الْكَافِرِين. َ

"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।" (সূরা তাওবা: ৩৭)

আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন যে কুফরে আকবার, তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল সূরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা জাহেলী যমানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন।

আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্ত্বেও আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর তা'জীম করত। সম্মানিত মাস চারটি। তিনটি লাগাতার আর একটি আলাদা। লাগাতার তিনটি হল- ১. যিলকদ ২. যিলহজ্ব ও ৩. মুহাররাম এবং অপরটি ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত। তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু জাতি হওয়া সত্ত্বেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াত না। স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে সামনে পেলেও হত্যা করতো না।

এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। এক সময় কিনানা গোত্রের 'কালাম্মাস' নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব করে, প্রতি বছর যিলকদ-যিলহজ্ব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে

নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা ধরব হারাম তথা যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাস আর মুহাররাম মাসকে বানিয়ে নেব হালাল তথা যুদ্ধ-অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব। তার প্রস্তাব আরবরা মেনে নিল।

পরের বছর তারা এর বিপরীত করত। অর্থাৎ ইব্রাহীমি ধর্মমতে মুহাররাম মাস হারাম হিসেবেই বহাল থাকত আর সফর মাস, যেটাকে তারা গত বছর হারাম সাব্যস্ত করেছিল এবছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল, তেমন হালালই মনে করা হয়। এভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মাসকে হালাল; আর হালালকৃত মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত। তাদের এ পরিবর্তিত রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত, কিন্তু হারাম মাস হালাল হয়ে যেত; আর হালাল মাস হারাম হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মুহাররাম মাস হালাল হত আর হালালকৃত সফর মাস হারাম হত।

'ক্বালাম্মাস'-এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ ক্বালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর 'জুনাদাহ্ ইবনে আউফ'-এর হাতে। তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত, তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়ামানুযায়ী হারাম ঘোষণা করত; আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। মুহাররামের পরিবর্তে তার পরবর্তী সফর মাসকে হারাম ঘোষণা দিত। পরবর্তী বছর ধর্মের নিয়মানুযায়ী মুহাররামকে হারাম আর সফরকে হালাল ঘোষণা দিত। শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার উক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

'কুফর বৃদ্ধি করে' অর্থ- কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও কুফর যুক্ত করল।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার।

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে। কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য জাতীয় নয়। অতএব প্রমাণিত হল- মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন- সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।" (আল-ফিছাল: ৩/২৪৫)

ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যে আয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা এসেছে-

এক.

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ- "নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে" এখানে কুফর বৃদ্ধি' দ্বারা কুফরে আকবার-বড় কুফর উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত ছিল তা কুফরে আকবার ছিল। তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর যুক্ত হয়ে তাদের কুফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা হুবহু ঐ ধরনের কুফরই হবে যে ধরনের কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে আকবার। কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা কুফরে আকবার।

ইবনে হাযম রহ. তাঁর বক্তব্যে "কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য বস্তু নয়। অতএব, প্রমাণিত হল মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।" এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার করেছেন।

শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি ভাষার একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি। যেমন-

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন-

"আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা করত তা কুফর। কেননা কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল এবং আল্লাহর হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে কাফের ছিল; পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি পেল।" (আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯)

দুই.

কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ তায়ালা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে তাদের আকীদা বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব বুঝা গেল, মাস পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর। তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই।

ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তার বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে-

"অতএব প্রমাণিত হল, মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে; অথচ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন, সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।"

উপরিউক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার হয় যে,

১. ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে

'ইসতিহলাল' তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে 'তাহলীল' ও 'তাহরীম'ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাস পিছিয়ে দেয়াকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন, আকীদা-বিশ্বাসের শর্ত করেননি। অতএব, কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তদ্রূপ আন্তরিক বিশ্বাস ঠিক রেখে শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায়।

২. শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কুফর

মাস পিছিয়ে দেয়া শরীয়তের একটামাত্র বিধান পরিবর্তন। একেই আল্লাহ তায়ালা কুফর সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রণয়নই কুফর। অতএব, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি শরীয়তের উপর হয় এবং রাষ্ট্রে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম থাকে, কিন্তু কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের কোন একটি অকাট্য আইন অপসারণ করে তদস্থলে কুফরী বিধান জারি করে, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে-যেমন, মদের বৈধতা দিয়ে দেয় কিংবা সুদের বৈধতা দিয়ে দেয় -তাহলে তাই কুফর হবে এবং এ কর্মে লিপ্ত শাসক কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।
একটা আইন পরিবর্তনকারী শাসকই যদি কাফের হয়, তাহলে যারা গোটা শরীয়তকে শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফরী বিধান প্রবর্তন করেছে তাদের বিধান কি হবে সেই বিষয়টি তো স্পষ্টতই বোধগম্য।

দলীল নং-৫

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن
'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১)
'এমন বিধান, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' দ্বারা শরীয়তবিরোধী বিধান উদ্দেশ্য। আর 'এমন দ্বীন, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন তথা 'ইসলাম' ভিন্ন অন্য দ্বীন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরদের শরীকরা কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে এমন কিছু বিধান দিয়ে থাকতে পারে, যেগুলো ইসলামবিরোধী; কিংবা এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি শুধু কিছু বিধান দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে এক ভিন্ন দ্বীন-ই প্রণয়ন করে দিয়েছে, যে দ্বীন অনুযায়ী তারা তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে।

এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী এ আয়াতের সাথে-

وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই বিধিত করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।'
(সূরা শূরা: ১৩)

অর্থাৎ মৌলিকভাবে আমাদের শরীয়ত ও অন্যান্য নবী-আলাইহিমুস সালাম-এর শরীয়তে কোন ব্যবধান নেই। মৌলিক দাওয়াত এবং মৌলিক বিধি-বিধান সকল নবীর শরীয়তেই এক। তবে যামানা বা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে এবং আরোও বিভিন্ন কারণে তাফসিলী বিধি-বিধানে ভিন্নতা এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন যামানার লোকজনকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। মৌলিক বিষয় সব শরীয়তেই এক ও অভিন্ন। এখানে বিশেষ মর্যাদার কারণে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা-আলাইহিমুস সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় সকল নবীর শরীয়তই এখানে উদ্দেশ্য।

আল্লামা আলুসী রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন-
"কয়েকজন নবী-আলাইহিমুস সালাম-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের শান-মান-মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে এবং তারা বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে। অন্যথায় দ্বীনে ইসলাম কায়েম করা, তথা তাওহীদ ও শরীয়তের ঐসব মৌলিক উসূল ও বিধান, যেগুলো যামানা কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয় না এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিশেষ কয়েকজন নবী আদিষ্ট হয়েছেন, অন্য সকল নবীও সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট।" (রূহুল মাআ'নী: ১৩/২১)
এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে ঐ শরীয়ত পালনের আদেশ দিচ্ছেন, যে শরীয়ত তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন; মৌলিক দিক থেকে যে শরীয়ত অন্য সকল নবীর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা এই শরীয়ত ছেড়ে মানব বা জীন শয়তানদের প্রণীত কিংবা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রণীত বিধি-বিধান কিংবা তাদের রচিত দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে, তাদেরকে ধমকি প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর এই আয়াত-

أَم ْلَهُم ْشُرَكَاء ُشَرَعُوا لَهُم ْمِن َالدِّين ِمَا لَم ْيَأْذَن ْبِه ِالله

'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১)
ইমাম নাসাফী রহ. (মৃত্যু: ৭১০হি.) বলেছেন,
“আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন/দ্বীনের বিধান দিয়েছেন, তারা কি তা গ্রহণ করবে? না তাদের এমন কিছু উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” (তাফসীরে নাসাফী: ৩/২৫১)

সহজ কথায় একে এভাবে বলা যায়-যেমনটা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃত্যু: ১২২৫হি.) বলেছেন-
"তারা কি আল্লাহর দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে, না তাদের শরীকদের দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে?” (তাফসীরে মাযহারী: ৮/৩১৬)
লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত বা শরীয়তের বিধি-বিধান ছেড়ে কাফেররা যেসব শয়তান, জীন বা ব্যক্তির প্রণীত দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে 'শরীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ- যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক দাবি করেছে, আর যেসব কাফের তাদের প্রণীত দ্বীন/বিধান গ্রহণ করেছে, তারা যেন এদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং এদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।
ইমাম নাসাফী রহ.-এর পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি ُشُرَكَاء)শুরাকা এর ব্যাখ্যা করেছেন ইলাহসমূহ।
ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত্যু: ৫১০হি.) বলেন-
“আল্লাহর বাণী-'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১) উদ্দেশ্য মক্কার কাফেররা। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তাদের কি এমন কতিপয় উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের এমন দ্বীন/দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'

ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 'তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন প্রণয়ন করে দিয়েছে'।" (তাফসীরে বাগাবী: ৪/১৪৩)

এখানে তিনিও شُرَكَاء (শরীক) এর ব্যাখ্যা করেছেন ইলাহ। অতএব যারা ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করে, তারা হচ্ছে মা'বূদ আর তাদের দ্বীন/বিধানকে যারা মেনে চলে তারা তাদের ইবাদতকারী, তাদেরকে রব ও মা'বূদরূপে গ্রহণকারী। এতএব এ উভয় শ্রেণিই কাফের। প্রণেতারা প্রণয়নের কারণে, অনুসারীরা অনুসরণের কারণে।

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন-

"মোট কথা- কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করল; তার প্রণীত শরীয়তবিরোধী আইনকে গ্রহণ করল, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করল। একথাই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা শোভিত করেছে।' (সূরা আনআম: ১৩৭) সন্তান হত্যায় তাদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে- 'তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শূরা: ২১) আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি এমন দ্বীন যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।" (আদওয়াউল বায়ান, সূরা: আশ-শূরা, ৭/১৫৬)

আজ যখন আমরা মুসলিম নামধারী আমাদের শাসকগোষ্ঠীর দিকে তাকাই, দেখতে পাই, তারা এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক কাফের গোষ্ঠী, জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের আইন-কানুনের আনুগত্য করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে শরীক; অপরদিকে শরীয়তবিরোধী নেজাম ও আইন কানুন প্রণয়ন করে নিজেদেরকেও আল্লাহর শরীকের আসনে সমাসীন করেছে।

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে সুন্নাহ থেকে দলীল

দলীল নং-১

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে:

قال عبادة بن الصامت) : دعانا النبي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا ًبواحا ًعندكم من الله فيه برهان (أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

'হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. বলেছেন, একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন, অতঃপর আমাদের থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে, আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা এবং আমাদের উপর কাউকে প্রাধ্যান্য দান সর্বাবস্থায় আমরা শাসকের আনুগত্য করব এবং আমরা শাসকদের সাথে শাসনকার্যের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না। নবীজী বললেন, তবে যদি তোমরা শাসকদের থেকে এমন কোনো স্পষ্ট কুফুরী কাজ দেখতে পাও যেটা কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে (কুরআন-সুন্নাহর) দলীল রয়েছে।' (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬৪৭)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, শাসকদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের সীমার ভিতর থাকে। যখন তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরের সীমায় প্রবেশ করে তখন তাদের অনুগত্য গুনাহের কাজ। বরং তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তাদেরকে উৎখাত করা জরুরী।

দলীল নং-২

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন:

(تفسيره في دحيم بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظ قال
رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل ،فقال المقضي عليه لا أرضى ،فقال صاحبه فما تريد ؟قال :أن نذهب إلى أبي بكر الصديق ،فذهبا إليه ، فقال الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي ،فقال أبو بكر

فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى صاحبه أن يرضى ،قال نأتي عمر بن الخطاب ،فأتياه فقال المقضي له :قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه ،فأبى أن يرضى ،فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك ،فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله ،فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله ،فأنزل الله :)فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية أ.هـ

'উৎবা বিন জামীরা (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন: দুজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার দায়ের করল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আর মিথ্যা দাবিদারের বিপক্ষে ফয়সালা দিলেন। রায় যার বিপক্ষে গিয়েছিল সে তার সাথীকে বলল, আমি সন্তুষ্ট নই। তার সাথী বলল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমরা আবূ বকর (রাযি.) এর নিকট যাব, অতঃপর তারা আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত হল। যার পক্ষে রায় গিয়েছিল সে বলল, আমরা দুজন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন। আবু বকর (রাযি.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছেন তার উপরই তোমরা স্থির থাক। তার সাথী তা মেনে নিতে অসম্মতি জানাল। সে বলল, চলো আমরা ওমর (রাযি.)-এর নিকট যাই। অতঃপর তারা তার নিকটে গেল। প্রথম ব্যক্তি বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার পেশ করলে তিনি আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে রায় দেন। ওমর (রাযি.) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা বলল। এমনটি শুনে ওমর (রাযি.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘর থেকে একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বের হলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার গর্দানে আঘাত করলেন এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন: কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫] [হাদীস: হাসান, তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫২]

নির্দেশনা:

১. যে ব্যক্তিকে ওমর (রাযি.) হত্যা করলেন তার ভিতরের অবস্থা ওমর (রাযি.) জানতেন না। বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। ইসলামের কোন বিধানকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি। তার অপরাধ হল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ফয়সালা নিজ প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তা না মেনে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফয়সালার জন্য যাওয়া। তার ব্যাপারে ওমর (রাযি.) ফয়সালা হল নাঙ্গা তলোয়ার। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে ভিন্ন কোন ফয়সালা তালাশ হল রিদ্দাহ তথা স্ব-ধর্ম ত্যাগ।

২. ওমর (রাযি.) এর মতের স্বচ্ছতা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন যে তার এই ফয়সালাই সঠিক ছিল কেননা উপরোক্ত ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিচার মেনে নিতে না পারায় সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

৩. যারা শরীয়াহর সকল বিধান পরিবর্তন করে নিজেরাই আইন রচনা করে, মুসলিমদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তি প্রদান করে- তাদের ব্যাপারে ওমর (রাযি.) ফয়সালা কী হতে পারে আর কুরআনই বা তাদের ব্যাপারে কি বলে এই বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

দলীল নং-৩

বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম বাধ্য হয়ে কুরাঈশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাযি.)। অতঃপর তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তখন আব্বাস রাযি. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন:

يا رسول الله إني كنت مسلما

হে আল্লাহর রাসূল। আমি তো মুসলিম ছিলাম!

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

الله اعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك

'আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।' [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকী, খণ্ড:৬, পৃষ্ঠা: ৩২২।

আব্বাস (রাযি.) নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন- "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলিম ছিলাম!" অর্থাৎ আমি তো বাধ্য হয়ে এসে ছিলাম তথাপি কি আমার উপরও কাফেরদের বিধান প্রজোয্য? আমাকেও মুক্তিপণ আদায় করতে হবে?

কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আব্বাস (রাযি.) এর কথা গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রয়োগ করলেন? এর কারণ হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার রুবুবী ফায়সালা হল তা কুফর। আর আব্বাস (রাযি.) কে এই কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে আর এটাই ছিল জহের বা বাহ্যিক দিক। তাই তার উপরও অন্যান্য কাফেরদের বিধানই প্রজোয্য হয়েছে। তার মুখের কথাকে গ্রহণ করা হয়নি। কেননা তা ছিল জহেরের খেলাফ বা বিপরীত। অন্যথায় নিশ্চিত তার কথা গ্রহণ করা হত। তবে তিনি যদি সত্যিই মুসলিম হয়ে থাকেন, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসে থাকেন তাহলে সেটি তো আল্লাহ তাআলা দেখছেন। তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: "আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।"

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে ইজমা থেকে দলীল

১. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর ফতওয়া :

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন-

'আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন আর তার বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বিধান নেই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন" সুতরাং যখন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা জানা গেলো, ইয়াহুদী- খ্রিষ্টানের বন্ধুরা তাদেরই দলভুক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। [আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা:৬৭]

২. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর ফতওয়া :

যে সমস্ত ব্যক্তি, মুসলিম ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ফতওয়া প্রদান করেন:

সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে কেউ তাতারদের পক্ষ নেবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য হবে। ইসলামী শরীয়াকে উপেক্ষা তার মাঝে যে পরিমাণ বিদ্যমান তাতারদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ বিদ্যমান। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল তারা নামায, রোজা আদায় করা এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও সালাফগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩৩২]

৩. আল্লামা ইমাম জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া :

আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ফকীহ মুফাসসির আল্লামা জাসসাস (রহ.) বলেন- 'এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশসমূহ থেকে কোন একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

চাই সে সন্দেহ বশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাঁরা তাদেরকে হত্যা করেছিলেন ও তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করে ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না তারা ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। [আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮১]

নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম যাকাত দানে অস্বীকৃতি প্রদানকারী সম্প্রদায়কে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।" আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিষয়ে বিধান কি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

শাসকের কাফের হওয়ার বিষয়ে কিয়াস থেকে দলীল

এক. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াসঃ

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা

আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সীরাতের উপর দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই। যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদান কারীদের বিরুদ্ধে তার আচারণ কিরূপ ছিল। যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তা পালন করছিল। তারা আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ থেকে শুধু একটি বিধান আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। আর তারা এটি করেছিল একটি দলীল, একটি সংশয়ের উপর ভিত্তি করে। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে দলীল পেশ করছিল। তথাপি আবূ বকর রাযি. তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছাড় দেননি, বলেননি, আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে এক দিন তারা ইসলামী বিধানের দিকে ফিরে আসে। বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করে ছিলেন, তাদের গর্দানে আঘাত করে ছিলেন। তাদের উপর আক্রমণ করে ছিলেন, তাদেরকে হত্যা করেছিলেন, তাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে বন্দি করে ছিলেন। যতক্ষণন না তারা পূর্ণরূপে ইসলামকে মেনে নেয় এবং আল্লাহ তাআলার সকল বিধানের সামনে আত্মসমার্পণ করে।

দুই. ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াসঃ

ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা

মুসলিমদের কোন দল ইসলামের অকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর কোন একটি যদি প্রকাশ্যভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন।

সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ] البقرة[٢٧٨ - ٢٧٩ /

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার করবে না। (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯)

আল্লামা খাযেন (রহ:) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

"মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহান্নাম আর রাসুলের সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তরবারী। তারা এ যুদ্ধের অর্থের ব্যপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, বলা হয়েছে এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়নি, চরমভাবে ধমক দেয়া হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে।

এটিও বলা হয় এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াইকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর সেটি ঐ ক্ষেত্রে, যদি কেউ সুদ খেতে থাকে আর খলীফা তার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে তাকে গ্রেফতার করবে অতঃপর সে তওবা করার আগ-পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করবে অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করবে, আটকে রাখবে। আর যদি সুদ গ্রহণকারী শক্তিধর হয়, সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে ইমাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যেমনটি করে থাকে বাগীদের বিরুদ্ধে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: যে ব্যক্তি সুদ খেতে অভ্যস্ত, তা থেকে বিরত থাকে না, মুসলিম খলীফার দায়িত্ব হল তাকে তওবা করার আদেশ দেওয়া যাতে সে বিরত থাকে অর্থাৎ তওবা করে। আর যদি বিরত না থাকে তাহলে দেহ থেকে তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে দেবে।" (তাফসীরুল খাযেন: ১/৩১৬)

ফুকাহায়ে কেরামের ফতওয়ার সারমর্ম

এক. যদি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে। (মুসলিম সরকার প্রধান) তাদেরকে গ্রেফতার করে শস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তারা শক্তি ধর হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে।

দুই. যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোন অকাট্য ফরয ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যদি কোন দল বা সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ ভাবে এমনটি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা উম্মাহর উপর ফরয হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে, যদিও তারা মুখে উক্ত বিধান কে স্বীকার করে।

তিন. কোন সম্প্রদায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন সুন্নাহ ঐক্যবদ্ধভাবে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও উক্ত সুন্নাহকে সুন্নাহ হিসাবে স্বীকার করে, তথাপি ইমাম মুহাম্মাদ [রহঃ] সহ অন্যান্য অনেক ফকীহর মতে তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করা হবে।

চার. কোন শাসক যদি জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে মুসলিমদের থেকে 'কর' ভ্যাট/ট্রাক্স গ্রহণ করে তাহলে ইমাম জাস্সাস (রহ:) এর মতে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাকে ও তার অনুসারী এবং টেক্স গ্রহণে সাহায্যকারীদেরকে যেখানে যেভাবে পাবে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে।

পাঁচ. কোনো মুসলিম শাসক যদি ইসলামের সমস্ত বিধান ঠিক রাখে কিন্তু শুধু মাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদী অভিযান করা ছেড়ে দেয়, তাহলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়।

কিয়াস: ইমামগণের মত হল, কোন সম্প্রদায় যদি নামায আদায় না করে, যাকাত প্রদান না করে অথবা সুদি লেনদেন করে, মুসলিমদের থেকে 'কর' গ্রহণ করে, আর এ ক্ষেত্রে

তারা নিজেদের শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করে, তাহলে উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা।

আর কেউ যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে, যাকাত দেয়া থেকে শুধু নিজেরাই বিরত থাকে তা নয়, এমনিভাবে সুদ শুধু নিজেরাই খায় এমনটি নয় বরং রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাতের বিধানকে অকার্যকর করে, সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করে এবং এ ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা বলে দাবি করে জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেয়, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা কী জিনিস তাই জানে না, তাহলে সে কিভাবে মুসলিম থাকে?! আর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন যে উম্মাহর উপর ওয়াজিব সেটি তো দিবালাকের ন্যায় স্পষ্ট।

আর এটা কি শুধু এক-দুটি বিধানের ক্ষেত্রে! শত-শত বিধানের ক্ষেত্রে তারা একই পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ইহুদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের দ্বারা রচিত তাগুতী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে শুধু তাদেরই সংশয় থাকতে পারে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলমে ওহীর নূর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে তাদের চিন্তা শক্তি লোপ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

ইতিহাস কী বলে?

সাহাবী যুগ

এক.

জান্নাতী যুবকদের সরদার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের নাতী হুসাইন (রাযি.) দউলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন এবং এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অথচ ইয়াজিদ কাফের ছিল না। কিন্তু দ্বীনের কিছু বিষয়ে কম বেশি করে ছিল। জান্নাতের যুবকদের সরদার তা সহ্য করতে পারেননি। নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

যারা হযরত হুসাইন রাযি. এর এই কর্মপন্থাকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক বলে এবং হযরত হুসাইন রাযি.কে শহীদ হিসাবে গণ্য করে, তাদের কীভাবে বর্তমান মুরতাদ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ব্যাপারে সংশয় থাকতে পারে?! তারা কীভাবে নিজেদেরকে হযরত হুসাইন রাযি. এর রুহানী সন্তান বলে দাবি করতে পারে?!!

দুই.

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাযি. তৎকালিন মুসলিম বিশ্বের খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অথচ আব্দুল মালেককে কেউ কাফের বা মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেনি। তথাপি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাযি.) তার মত ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন।

তাবেয়ী যুগ

তিন.

সাইদ বিন জুবাইর, আমের শা'বী, (যারা বসরার তাবেয়ীনদের মধ্যে আলেম ও ফকীহ ছিলেন) এবং কুফা নগরীর আরো অনেক উলামায়ে কেরাম রহ. হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎকালিন অনেক আলেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাফের বা মুরতাদ ছিল না।

চার.

আন-নাফসুস যাকিয়্যা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. মাল দিয়ে তাকে সাহায্য করেন, নিজে স-শরীরে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে ওযর পেশ করেন। এ জিহাদকে তিনি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন এবং ৫০ টি হজ্জের চেয়ে মর্যদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। মূলত এ কারণেই খলীফা মানসুর তাকে বন্দি করে এবং বিষ পান করিয়ে শহীদ করে। আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

ছয়শত হিজরী পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরয়ী আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত জঘণ্য আপরাধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা তখন আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন করে কোন শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকা ছিল কল্পনার বাইরে। তখন সর্বোচ্চ যা ঘটতো তাহল, ঘুষ, আত্মীয়তার সম্পর্ক অথবা এ ধরনের পার্থিব কোনো স্বার্থের পিছনে পড়ে বিচারকরা এক জনের হক্ব আন্যজনকে দিয়ে দিত।

1. সর্বপ্রথম মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু হয় ৬০০ হিজরীর পর। তাতাররা মুসলিম কিছু দেশ দখল করে অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ার অনুসরণ করে না। বরং কোরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে, কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে। সবগুলোর সমন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা ইয়াসিক। এর ফলে তৎকালীন সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) সহ অন্যান্য আলেমগণ তাদেরকে মুরতাদ হবার ফতওয়া প্রদান করেন।

2. এর পর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরস্ক যখন মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল তখন দাউলাতে উসমানিয়ার সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহ:) উক্ত কর্মকে কুফর ও রিদ্দাহ বলে ফতওয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন।

3. দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত হয়, তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা আহমাদ শাকের (রহ:) ও তার ভাই মাহমুদ শাকের (রহ:) এই বিধান রচনা কারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন।

4. ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলাতে থাকে, তখন সিরিয়ান কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ:) কে তাদের ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন।

উপরিউক্ত প্রত্যেক শাসক জালিম ছিল; কাফের নয়। তথাপি উম্মাহর অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। অস্ত্র ধারণে ফতওয়া দিয়ে ছিলেন, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে ছিলেন। সুতরাং শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায়, শাসক থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উম্মাহর উপর দায়িত্ব বর্তায়, খাছ করে উম্মাহর উলামা শ্রেণির উপর দায়িত্ব যে কী পরিমাণ বেড়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মানবরচিত সংবিধানের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি

প্রথমতঃ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ কিভাবে কাটাবে তার নির্দেশনা ইসলামে দেয়া আছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানব জাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধান তাতে বিদ্যমান আছে এবং সবক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তাই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আর এটাকে মেনে নেয়ার নামই ঈমান।

যারা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে, আল্লাহর বিধানকে পিছনে ফেলে নিজেরাই বিধান রচনা করে। মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, কেউ যদি তা অমান্য করে এবং আল্লাহর বিধান পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান করে। নিশ্চিত সে নিজ রচিত সংবিধানকেই উত্তম মনে করে, আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে সময় অনুপযোগী মনে করে। তাই সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ

ইসলাম ধর্মের মূল হল তাওহীদ। কিন্তু আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার কারণে আজ সমাজে তাওহীদের অবস্থা নাজুক। হাজার হাজার মুসলিম মাজার পূজা, কবর পূজা করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। কিছু দাজ্জাল, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এজেন্ট নিজেদেরকে পীর দাবি করে লাখ-লাখ মানুষের মাঝে কুফর ও শিরক ছড়াচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিশৌধ, ভাস্কর্যের নামে মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা হচ্ছে। এধরনের নানা শিরকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরন্তন জাহান্নামকে নিজেদের ঠিকানা করে নিচ্ছে। এর মূল কারণ- এই শাসকরা। তারা যদি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন না করতো, আল্লাহর বিধান দ্বারা যদি দেশ পরিচালনা করত, তাহলে এই শিরকগুলো সমাজে বিদ্যমান থাকত না। লাখ-লাখ মানুষ চিরন্তন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হত না। যাদের কারণে লাখ-লাখ মানুষ কাফের হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তারা কোনোমতেই মুসলিম হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ

ইসলামের দ্বিতীয় রোকন হল নামায। আজ শতকরা কত জন মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে? যদি ইসলামী বিধান থাকত তারা নামায ত্যাগ করতনা। সুদ একটি জঘন্য হারাম কাজ যাকে আল্লাহ তাআলা, তাঁর ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মানব রচিত সংবিধান সেটিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ এর কালো থাবা থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারছেনা। মানব রচিত সংবিধান ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদান করেছে। আর যদি ব্যভিচার উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হয় তাহলে এ সংবিধানের মতে তা জেনাই নয়। জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে এ সংবিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে। মোটকথা সকল পাপের দ্বার উন্মচিত করেছে, অনেক নেকের দ্বার বন্ধ করেছে।

চতুর্থতঃ

মানবরচিত সংবিধানের দুটি মূলনীতি হল ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাক স্বাধীনতা।

ধর্ম নিরপেক্ষতা:- ধর্ম নিরপেক্ষতার আবরণে সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানো হচ্ছে। মুসলিম যুবকরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ সিলেবাসের মাধ্যমে ছোট ছোট শিশুদের হৃদয়ে ধর্ম বিরোধী বীজ বপণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রে খ্রিষ্টান মিশনারী গুলোকে অপতৎপরতা চালানোর অনুমতি ও নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে তারা হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিমকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে।

বাক স্বাধীনতা :- বাক স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে, পত্র-পত্রিকায় ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া হচ্ছে। আর এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে এই শাসকবর্গ ও তাদের রচিত সংবিধানের সহায়তায়। উপরের আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, কাফের-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রব্বানী বিধান অমান্য করা, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তাগুতদের শরণাপন্ন হওয়াসহ নানাবিধ অপরাধের কারণে বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ কাফের ও মুরতাদ, যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, ইসলামের বিভিন্ন খেদমত করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিক না কেন।

দ্বীন কী?

দ্বীন বলা হয়, কোন ব্যক্তি যা নিজের জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলে; চাই তা হক্ব হোক কিংবা বাতিল। অনুরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হোক বা জীন, শয়তান কিংবা মানুষের বানানো হোক।

দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (সূরা কাফিরূন: ৬)

এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত এবং কাফেরদের মনগড়া মতবাদ, উভয়কেই দ্বীন বলা হয়েছে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

'আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।' (সূরা আলে ইমরান: ৮৫)

এখানে ইসলাম ব্যতীত অন্য মতবাদকে দ্বীন বলা হয়েছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ

'ফেরাউন বলল আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি; আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়- সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে।' (সূরা মু'মিন: ২৬)

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

"ফেরাউন আশঙ্কা করছে, মূসা আলাইহিস সালাম লোকজনকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং তাদের রুসূম-রেওয়াজ এবং অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে ফেলবে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৯)

এখানে ফেরআউনী সমাজে প্রচলিত মনগড়া রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানূনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

'এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশার দ্বীন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে তার নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।' (সূরা ইউসুফ: ৭৬)

এখানে মিশরের কাফের বাদশার রাষ্ট্রীয় আইনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. আরও বলেন-

"অর্থাৎ মিশরের বাদশার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে তার কাছে রাখার অধিকার ছিল না। জাহ্হাক রহ. সহ আরো অনেকে এমনই বলেছেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪০১)

আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যু: ৯৮২হি.) বলেন-

"বাদশার আইন ও ফায়সালা অনুযায়ী (তার ভাইকে তার কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।) কাতাদাহ রহ. এমনই বলেছেন। কারণ বাদশার আইনে চোরের শাস্তি ছিল, প্রহার এবং চুরিকৃত বস্তুর দ্বিগুণ জরিমানা। ইয়াকূব আলাইহিস সালামের শরীয়তের মতো গোলাম বানিয়ে রাখা, (বাদশার রাষ্ট্রীয় বিধান) ছিল না।" (তাফসীরে আবুস সাউদ: ৪/২৯৭)

দ্বীনের পরিচয় জানার পর এই বিষয়টি স্পষ্ট যে- বর্তমান প্রচলিত কুফরী গণতন্ত্র মতবাদ মূলত একটা নতুন দ্বীন, নতুন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারীরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার শর্তেই নির্বাচনে দাঁড়ায়। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ তথা সংবিধানের সম্মান রক্ষার শপথ নেয়। একে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুদৃঢ় অঙ্গিকার করে। এর জন্যই তারা বাহিনী গঠন করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই তারা চলে। বিচারাচারের প্রয়োজন হলে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই বিচার চায়। এ ধর্মকেই তারা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এর বিধান দিয়েই তাদের বিচারাচার করে। এ ধর্মের বিরোধিতা যারা করে, তারাই অপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধর্ম যারা যমীনে বাস্তবায়ন করতে চায়, এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী তারাই জঙ্গী-সন্ত্রাসী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, নাশকতাকারী, উগ্রবাদী, শান্তিবিনষ্টকারী, মানবতাবিরোধী ইত্যাদী অপরাধে আখ্যায়িত হয়। অতি গুরুতর ও

অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। তাদের উপর জঘন্য থেকে জঘন্য রকমের নির্যাতন করা হয়।

বর্তমান দুনিয়াতে গণতন্ত্র ছাড়া ইসলামের পর আর এমন কোন ধর্ম নেই, যার অনুসারিরা কঠোরতা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের ধর্ম পালন করে। নেই; কিছুতেই নেই। গণতন্ত্রের সামনে সকলেই (একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছাড়া) নতি স্বীকার করেছে, কিন্তু গণতন্ত্র কারোও সামনে নতি স্বীকার করেনি। কাজেই এ ধর্মের ধারক বাহকরা, এ ধর্মের অনুসারীরা তেমনি কাফের, যেমন ইহুদী ধর্মের অনুসারিরা কাফের, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা কাফের, যেমন বৌদ্ধরা কাফের, যেমন হিন্দু-শিখরা কাফের। তারা শুধু আমাদের শরীয়তের সাথেই কুফরী করেনি, তারা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সকল শরীয়তের সাথে কুফুরি করেছে। সকল নবীর সকল কিতাব, সকল জাতির সকল ধর্ম প্রত্যাখান করে একমাত্র নিজেদের খাহেশাতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে ঐ কথাই প্রযোজ্য, যেমনটা আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেছেন-

"কোন সন্দেহ কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক। এদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে, তার সব থেকে বের হয়ে আসে।" (আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, (মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত একটি রিসালা।)

শরীয়তবিরোধী কোন দ্বীন তথা জীবনবিধান প্রণয়ন যেমন কুফর, শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়নও তেমনি কুফর। অতএব গণতন্ত্র নামক এই কুফরী ধর্ম যারা প্রণয়ন করেছে, তারা যেমন কাফের; এই ধর্মের কোন একটা বিধান যারা প্রণয়ন করবে তারাও কাফের। সে মুখে যতই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুক, যতই নিজেকে মুসলমান দাবি করুক, নামায-রোযা যতই করুক- সে বেঈমান; সে মুরতাদ। এই কুফরী কর্ম

থেকে যতক্ষণ ফিরে না আসবে, তার কোন দাবিই কাজে আসবে না, কোন ইবাদতই তার উপকার করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না; আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে নেয়।' (সূরা নিসা: ৬৫)

এ আয়াতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথা তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণ করাকে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর প্রদত্ত ফায়সালাকে জাহিরী বাতিনী সর্বদিক থেকে মেনে নিতে হবে। তার সামনে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠা, সংশয় বা আপত্তি থাকতে পারবে না। বাহ্যিকভাবেও তার প্রতি কোন ধরনের বিরূপ ভাব দেখানো যাবে না। এই সবগুলোর সমন্বয় সাধন হলে তবে ঈমান সাব্যস্ত হবে।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফি ফক্বীহ ও মুফাসসির ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন-

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের।' ইরশাদ করেন, 'আমি কোন রাসূল এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে।' আরো ইরশাদ করেন, 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' (সূরা নিসা: ৮০) আরো ইরশাদ করেন, 'কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে,

অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তয়ালা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য যে ফরয, তাকিদের সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং এর মাধ্যমে এ ও বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে পড়ার ভয় করে।' (সূরা নূর: ৬৩) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচারী, তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীকে ঈমান থেকে বহিষ্কৃত সাব্যস্ত করেছেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে 'কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে।'

এই আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক কিংবা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাদেরকে হত্যা করার এবং তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও ফায়সালাকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়।" (আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস: ৩/১৮০-১৮১)

আল্লাহ তায়ালার একটি বিধান না মানার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্সাস রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।'

আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান কি হতে পারে; তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

"মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তা-ই একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করা ও তার আনুগত্য করা অবধারিত। এ কারণেই তিনি বলেছেন, 'অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে'। অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে, আপনি যে ফায়সালা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরনের বাক-বিতণ্ডা বা বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ণরূপে তা মেনে নেবে।"(তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়ে সংশয় নিরসন

প্রথমত, কুরআনের বিভিন্ন আয়েতে যে 'তাহকীমে রাসূল' তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়াকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিশ্বাসের বিষয়; কর্মের বিষয় নয়। অর্থাৎ সব বিষয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়া আবশ্যক-এই বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট। বাস্তব বিচার আচারের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে-এমনটি জরুরি নয়। আর এই বিশ্বাস তো আমাদের শাসকদের আছেই। সুতরাং এই আয়াতের দাবিতে তারা কাফেদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ বিষয়ে প্রথম কথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে, সকল বিষয়ে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি-মুসলিম নামধারী সকল গণতান্ত্রিক শাসকই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এমন কথা মোটেও ঠিক নয়। কারণ তাদের অনেকেই সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের সমালোচনা করে থাকেন। শরীয়তের বিধানকে সেকেলে, আধুনিক কালের জন্য অনুপযোগী, পশ্চাৎগামী, মানবতাবিরোধী, বর্বর ইত্যাদী আখ্যায়িত করেন। এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণও পেশ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, 'তাহকীম' তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি একটি আমল ও বাহ্যিক কর্মের নাম। কাজেই শুধু বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, বাস্তব জীবনেও সকল বিষয়ে রাসূলসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানানো আবশ্যক। তাছাড়া কেউ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না।

বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

"আল্লাহ তায়ালা নিজের কসম খেয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'তাহকীমে রাসূল' তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়া ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না। শুধু এতটুকই যথেষ্ট নয় বরং তারপর আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতে হবে এবং তার ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ করতে পারবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল, 'তাহকীম' অন্তরে মেনে নেয়া নয়; বরং তা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়। আর এই তাহকীমই হচ্ছে ঈমান। যার মধ্যে তাহকীম পাওয়া যাবেনা, তার ঈমান নেই।" (আল-ফিছাল: ৩/১০৯)

ইবনে হাযম রহ. আরোও বলেন-বলেন-

"আল্লাহ তায়ালা তাহকীমে রাসূলকে ঈমান সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, এটা ছাড়া ঈমান অর্জন হবে না। সাথে সাথে তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ রাখা যাবে না। অতএব, ইয়াকিনীভাবে প্রমাণিত হল, ঈমান বাহ্যিক আমল, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির সমষ্টির নাম। কেননা, তাহকীম একটি বাহ্যিক আমলের নাম। আর তা মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত এবং অন্তরের কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়া ব্যতীত হতে পারে না। আর এই কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়াটাই হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস।" (আদ-দুররা: ৩৩৮)

আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিচারাচারের ভিত্তি শরীয়তের উপর না হলে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি স্বত্ত্বেও ঈমানদার বলে গণ্য হওয়া যাবে না। এ বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন এভাবে-

فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر.

'অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক।' (সূরা নিসা: ৫৯)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-'

"যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক-এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে না যায় এবং এ দু'য়ের দিকে প্রত্যার্পণ না করে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী নয়।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৬)

এ আয়াতে আছলে ঈমান তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য। কাজেই যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী না বানাবে, তারা সম্পূর্ণ ঈমানহারা কাফের বা মুরতাদ। কেননা, কুরআনে কারীমের শব্দাবলীকে তার হাকীকী তথা প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোন প্রকার দলীল ব্যতীত রূপক ও বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম অর্থ করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ তায়ালা যেখানে নিজের জাতের কসম খেয়ে এবং এতগুলো তাকিদ ব্যবহার করে বলছেন যে, তারা ঈমানদার হতে পারবে না; তাহকীমে রাসূল ব্যতীত, সেখানে কিছুতেই অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। নতুবা কসম খাওয়ারই কি দরকার ছিল আর এতগুলো তাকিদ ব্যবহারেরই বা কি দরকার ছিল!

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন-

"এটি এমন এক সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। এই বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার মতো কোন দলিলই শরীয়তে নেই। এমন কোন প্রমাণও নেই যা বুঝায় যে, এখানে ঈমানের বিশেষ কোন প্রকার (অর্থাৎ কামালে ঈমান) উদ্দেশ্য।" (আল-ফিছাল: ৩/১৯৩)

কামালে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ না করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়। এ থেকে বুঝা যায়, শাসকরা কাফের নয়, মুমিন। তবে পরিপূর্ণ ও পাকা ঈমানের অধিকারী নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা কুফর ও রিদ্দাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনের পথে অটল-অবিচল রাখুন। আমীন!

গণতন্ত্র (Democracy) কুফর কেন?

গণতন্ত্র হল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং এর প্রয়োগ ঘটে জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রনয়নের মাধ্যমে। গণতন্ত্রে আল্লাহর শরীয়তের কোন মূল্য নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন করবে সেটাই আইন, সেটাই পালনীয়। আল্লাহর শরীয়ত কি বলে তা গণতন্ত্রে দেখার বিষয় নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি 'ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওলা'- 'রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ' নীতির উপর। তাই তাদের স্লোগান- 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার', 'রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই' ইত্যাদি। জনগণ কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন। তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে। যেমন:

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শাস্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন।

খ. আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। গোটা অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে হালালকরণ।

গ. আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং মানবতাবিরোধি জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে হারামকরণ। এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার। যেমন- কোন শাসক যদি আইন প্রবর্তন করে যে, 'আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে। চার রাকাআত পড়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'- তাহলে এমন শাসক নিশ্চিত কাফের। শরীয়তের বিধান তথা 'আসরের নামায চার রাকাত ফরয' স্বীকার সত্ত্বেও সে কাফের। যারা নামায পরিবর্তন করে-তারা, আর যারা যিনা, চুরি ইত্যাদির শরীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে-তাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান নেই। সকলেই কাফের ও মুরতাদ।

দ্বিতীয়ত এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর আইন পরিবর্তনের মতো তা এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার। ফলে:

ক. শরয়ী শাসনের বিপরীতে যারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, তারা কাফের।

খ. শরীয়তের পরিবর্তে এই শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা যেসব শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারাও কাফের।

গ. আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, তারাও কাফের।

ঘ. যেসব বাহিনী শক্তিবলে এই কুফুরী শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত।

ঙ. এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্তুষ্ট, এর সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এর সাহায্য-সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, এসব দলকে ভোট দেবে- তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত।

উল্লেখ্য, এসব কারণে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা, তাবীল ইত্যাদির মত তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়। হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কেবল এ ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার অধিকার রাখেন। জনসাধারণের জন্য আবশ্যক উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা। সুনির্দিষ্ট তাকফীরের বিষয়টি উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দেয়া।

ইসলামী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

মদিনা সনদে বর্ণিত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ছিল জনস্বার্থ সম্বলিত। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক পরিচালিত। এর সকল নীতিমালা ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধকরণের মোক্ষম হাতিয়ার। মদিনা সনদের ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদর্শ রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল। এ সংবিধানে মহানবি (দ) সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করেন যা ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করে। রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির নাগরিকদের সন্তুষ্টির উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে-এ পরম সত্য বিশ্ববাসীকে উপলব্ধি করানোর জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সমন্বয়ে এক অনন্য জাতি গঠন করেন যারা রাজনৈতিক দিক থেকে একই আইন মান্য করতে বাধ্য থাকলেও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিল স্ব স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীন। কুরআনের ভিত্তিতে এ

রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রণীত হলেও অমুসলমানগণ সংস্কৃতির অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হয়। আইনের চোখে সমতা, বাক স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা, গঠনমূলক সমালোচনার দ্বার উন্মুক্তকরণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অমুসলমানদের জিজিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদান, অপরাধীর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্তি, প্রচলিত গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পুনর্বহাল, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রাষ্ট্র রক্ষার্থে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতিগ্রহণ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তির বিধান আরোপ প্রভৃতি ছিল মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত পদক্ষেপ

মহানবী (দ) প্রবর্তিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ কেবল কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ ছিলো না বরং দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে তিনি এর বাস্তব প্রয়োগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামী আদর্শালোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ফলশ্রুতিতে ইসলাম আরবের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে সমাদৃত হয় এবং ইসলামের সাম্য ও ন্যায়ের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আত্যাচারী শাসকদের শোষণে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত মানবসমাজ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এরই মাধ্যমে মহানবি (স) এর ইন্তেকালের এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে তার সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুসৃত গণতন্ত্রের স্বরূপ নিম্নরূপঃ

১) নির্বাচন পদ্ধতি:

মদিনা সনদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রে মহানবি (দ) খোদ রাষ্ট্রনায়ক হলেও তিনি এ পদ জোরপূর্বক আদায় করেননি। বরং মদিনায় দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে লিপ্ত আউস ও খাযরাজ গোত্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হিজরতের পর তথায় শান্তি শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আনসার ও মুহাজিরগণ কর্তৃক নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। তাদের পক্ষ হতে অপরাপর জাতি বা গোত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা লাভ করেন। সে বলেই তিনি একজন

নবি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মদিনায় সকল জাতি ও গোত্রের জন্য এ সনদ প্রণয়ন করেন এবং নিজ দায়িত্বে সকল নাগরিককে তা প্রদান করেন (খান ও রহমান, ২০১৬) এভাবে অপরাপর সকল ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর নির্দেশের প্রেক্ষিতে জনমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত কখনোই গৃহীত হতো না। পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সকল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসৃত হয় এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা) পর্যন্ত সকল খলিফাদের নির্বাচনে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এমনকি তৃতীয় খলিফা নির্বাচনকালে সমযোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক সাহাবীর নাম প্রস্তাবিত হলে ভোট গ্রহণ করে হযরত উসমান (রা) কে নির্বাচিত করা হয়।

২) সমানাধিকার নিশ্চিত:

মদিনায় হিজরত করার পর মহানবী (দ) কর্তৃক গণতন্ত্রের আদর্শ কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। এ সময় তিনি নিজ ধর্ম ও গোত্র ছাড়াও বিধর্মী (ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান) ও মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের সাথে সহাবস্থানের প্রেক্ষিতে সকলের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় তাদের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান পূর্বক মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। এই সনদে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (হাসান, ২০১৬)। এমনকি ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিধর্মীদের গীর্জা ও মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব ও রীতিনীতি পালনে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে মহানবী (স) খ্রিস্টানদের জান-মাল রক্ষা ও তাদের সাথে সহাবস্থানের নিমিত্তে তাদের স্বার্থ সম্বলিত কতিপয় নীতি প্রবর্তন করে ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে একটি চার্টার প্রদান করে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন যা ইতিপূর্বে তাদের খ্রিস্টান শাসকবর্গ দেয়নি। এ প্রসঙ্গে সৈয়াদ আমীর আলী বলেন, One of the blest monuments of enlightened tolerance that the history of the world can produce (আলী, ২০২৪)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও সকল ধর্মাবলম্বীদের সমানাধিকার প্রদানের এ ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি মুসলিম প্রজাদের ন্যায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অমুসলমান প্রজাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় যারা যৌবনে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রেখেছিল। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা

হযরত ওমর (রা) এর যুগে এ ধরণের এক ইহুদিকে তার বার্ধক্যের সময় ভিক্ষারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হযরত ওমর (রা) তার কাছে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। ইহুদী ব্যক্তি তার দারিদ্র্যের কথা জানালে ওমর (রা) তাকে বাইতুল মালের সচিবের কাছে নিয়ে যান এবং আমৃত্যু মাসিক বৃত্তি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "এটা কখনোই সমীচীন হতে পারেনা যে, একজন অমুসলিম প্রজা যৌবনে জীবন দিয়ে আমাদের নিরাপত্তায় অবদান রাখবে, অথচ বার্ধক্যে আমরা তার জীবিকার ব্যবস্থা না করে তাকে অসহায় ছেড়ে দিবো (হুসাইন, ২০১৭)।"

খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আমলে কিছু সংখ্যক মুসলমান একজন ইহুদীর জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি মসজিদটি ভেঙে ফেলার এবং উক্ত জমি ইহুদী মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। **১৯৩৩** খ্রিস্টাব্দে লেবাননের একজন খৃস্টান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কারদাহী লিখেছেন যে, বায়তুল ইহুদী নামে ইহুদীর সেই বাড়িটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে (হামিদুল্লাহ, ২০০৫)।

এছাড়াও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য প্রয়োজনানুসারে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা দামেস্ক সফরের সময় হযরত ওমর (রা) সেখানকার একটি গ্রামে কতিপয় খ্রিস্টান কুষ্ঠরোগীর কথা জানতে পেরে তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং তাদের জন্য রেশনে খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। এভাবে মুসলিম শাসকদের অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হতো (হুসাইন, ২০১৭)।

৩) রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার:

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায় নীতি হতে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামী আইনে নেই। এ নীতির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় মহানবী (দ) সহ প্রত্যেক খলিফার জীবন পদ্ধতিতে। ইসলামী রাষ্ট্রের আয় হতে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে তাদের অধিকার ছিলোনা। বরং এক্ষেত্রে রাসূল (দ) গণীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার প্রাপ্য অংশ রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করতেন (খান, ২০১৬)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রেও এ নীতির বিচ্যুতি ঘটেনি। উপরন্ত তারা বিভিন্ন সময় নিজেদের সম্পদ হতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দান করতেন। এমনকি কখনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তা জনগণের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করতেন। একবার হযরত ওমর (রা)'র চিকিৎসার জন্য মধুর প্রয়োজন হলে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে মধু না থাকায় তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত মধু ব্যবহার করেন। আর এ মধু যেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্পদ তাই তিনি তা ব্যবহারের পূর্বে জনগণের অনুমতি গ্রহণের জন্য অসুস্থাবস্থায় মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর মুসলমানদের একত্রিত করে তাদের অনুমতি নিয়ে মধু সেবন করেন (হালিম, ২০১৭)।

৪) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন (আল-কুরআন,৫:৮)।"

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (দ) থেকে শুরু করে প্রত্যেক সাহাবী কুরআনের অনুসরণ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কুরআনে কোনো বিষয়ের সমাধান পাওয়া না গেলে তা হাদিস হতে, হাদিসে না পেলে ইজমার আদর্শ অনুসরণ এবং ইজমা দ্বারা নিষ্পত্তি করা না গেলে বিচারক নিজস্ব মতামত প্রয়োগ এবং জটিল বিষয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতেন। এ ব্যাপারে মহানবী (দ) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) কে ইয়েমেনের প্রশাসক নিয়োগকালে যে নির্দেশনা প্রদান করে গিয়েছেন তারই ভিত্তিতে হযরত ওমর (রা) বিখ্যাত কাজী শুরাইহ (রা) কে কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার পরামর্শ দেন। ইজমা দ্বারা অনুরূপ ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তিনি শুরাইহকে নিজ মত প্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করেন। জটিল ব্যাপারগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আদেশ দেন (খান, ২০১৬)। বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয়। উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণের মাধ্যমে বিচারকার্যে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে বিচারককে বরখাস্ত করা সহ তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়

হযরত ওমর (রা) এর পুত্র আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে নিজ হাতে আশিটি বেত্রাঘাত করার ঘটনা আজও সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

৫) স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি:

মহানবী (দ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি পরিহার করে ন্যায়পরায়ণ, সৎ, কুরআন ও হাদিসে অভিজ্ঞ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হতো। হযরত ওমর (রা) এর যুগে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের পূর্বে তাদের সম্পত্তির হিসাব নেয়া হতো। অতঃপর তাকে নিয়োগনামা প্রদান করা হতো। উক্ত নিয়োগনামায় উক্ত কর্মচারীর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ক্ষমতার পরিমাণ উল্লিখিত থাকত। খলিফার স্বাক্ষর ও সিলমোহরকৃত সেই নিযুক্তিপত্রে কয়েকজন গণ্যমান্য আনসার ও মুহাজির ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতেন এবং মসজিদে সাধারণ সভায় নাগরিকদের সম্মুখে তা পাঠ করে শোনানো হতো। যেহেতু এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই প্রশাসকগণ সকলেই নিয়মিত বেতনসহ রেশন পেতেন। বেতনের পরিমাণও ছিল উচ্চ। যাতে শাসকগণ খরচ যোগানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যের বাইরে অন্য কাজ না করে। কর্মচারীদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। অবৈধ উপায়ে ধন সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল (খান, ২০১৬)।

৬) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:

মহানবী (দ) এর যুগ থেকেই বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। খলিফাদের যুগেও সে স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি। স্বয়ং খলিফাগণ প্রয়োজনে বিচারকের সম্মুখীন হতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনো কখনো বিচারকের রায় খলিফাদের বিপক্ষে যেতো। এক্ষেত্রে খলিফাগণ সে রায় নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এমনই এক বিচারে হযরত আলী (রা)'র বিপক্ষে রায় প্রদত্ত হয় যেখানে তিনি এক বেদুঈনের হাতে থাকা তরবারিকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া তরবারি বলে দাবি করলেও প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় কাজী শুরাইহ উক্ত তরবারিটি বেদুঈনকে দিয়ে দেন। যদিও পরবর্তীতে উক্ত বেদুঈন তার ভুল স্বীকার করে এবং ন্যায়বিচারের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে ইসলাম গ্রহণ করে (গণি, ২০২২)।

৭) বাক-স্বাধীনতা:

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাক স্বাধীনতা। মানব ইতিহাসে বস্তুত ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে বাকস্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করে। প্রয়োজনবোধে একজন সাধারণ নাগরিকও প্রশাসকের সমালোচনা করতে পারত। তবে এই স্বাধীনতা আইন অমান্য করে আন্দোলনের ন্যায় ছিল না কিংবা কারো কুৎসা রটনার জন্যও উন্মুক্ত ছিল না। স্ব-স্ব অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মদিনা রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিক স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ও অপরের সমালোচনা করতে পারত। স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও স্বীয় বিবেকের প্রতি আস্থাই ছিল ইসলামি রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য (খান, ২০১৬)। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উক্ত মত প্রকাশকে কোনো শাসক অপরাধ হিসেবে গণ্য করতেননা। বরং তাকে স্বাগত জানাতেন। হযরত ওমর (রা)'র শাসনামলে এক ব্যক্তি তাঁর সামনে গিয়ে রাগান্বিত হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহকে ভয় করুন। উপস্থিত একজন বলল, তুমি কি আমীরুল মুমিনীনকে আল্লাহকে ভয় করতে বলছো? ওমর (রা) বললেন, তাকে বলতে দাও, সে যা বলছে তাতো ভালোই। তোমরা যদি এ কথা না বল তবে কোনো কল্যাণ হবে না। আর আমরাও যদি তা কবুল না করি তখনো কোনো কল্যাণ থাকবে না (হুসাইন, ২০১৭)।

৮) পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা:

পরামর্শ সভা এবং খেলাফতকে ইসলামে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয় (হাসান, ২০১৬)। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (দ) এর যুগে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ঐশীবাণীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত হলেও জনসাধারণের স্বার্থযুক্ত বিষয়গুলো তিনি পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন করতেননা। প্রাক ইসলামি যুগে প্রচলিত শূরা পদ্ধতি (পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন) ও কুরআনের নির্দেশ অনুসারে রাসূল (দ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন (খান, ২০১৬)। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করতেন। যেমন বদর যুদ্ধের পূর্বে সাধারণ সভার আলোচনার ভিত্তিতে বদর প্রান্তরে সমবেত হওয়ার এবং উহুদ যুদ্ধের পূর্বেও অনুরূপ সাধারণ সভার আলোচনায় উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের স্থান নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এমনকি পরামর্শ সভার আলোচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো। যেমন উহুদ যুদ্ধে নগরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার পক্ষে অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করায় সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় (প্রাগুক্ত)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির একক পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। যেমন মদিনা রাষ্ট্র প্রাচীর বেষ্টিত না হওয়ার দরুণ অরক্ষিত থাকায় খন্দকের যুদ্ধের সময় সালমান ফারসী (রা)'র পরামর্শে রাষ্ট্রের চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ ব্যবস্থা আরো কার্যকরী হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করলেও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই করতেন না। মজলিস-উস সূরা প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শের সূচনা করেন (গণি, ২০২২)। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আলোচনা ছাড়া কোন সরকারি কাজ চলতে পারে না। কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি নির্বাচন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের কৃষি ভূমি বন্টন সহ সকল ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও পট পরিবর্তনের দরুন পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়লেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কখনোই হ্রাস পায়নি। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন সহ পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফাগণ উক্ত পরামর্শ সভা পুনরায় চালু করেন (খান, ২০১৬)।

৯) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন:

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সকল কার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত ছিল। এ সময় রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির ব্যাপারে জনসাধারণ পরামর্শ দিতে পারত। মহানবি (দ) এবং তাঁর খালিফাগণ 'বিশেষ পরামর্শ সভা' এবং 'সাধারণ সভা' নামক দুটি পরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মহানবি (দ) এবং খলিফাগণ দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে কতিপয় বিশেষ সাহাবির পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু জটিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভা আহুত হতো। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ছিল। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত বিভক্ত হলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বলবৎ হতো (প্রাগুক্ত)। বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে মজলিসে খাস বা বিশেষ সভা গঠিত হতো। উক্ত সভার সদস্যগণের

সাথে পরামর্শ করে গঠনমূলক আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ফলে মতানৈক্য বা বিরোধিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়।

১০) জবাবদিহিতা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম রূপরেখা ছিল জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিচার বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো। পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায় নীতি থেকে বিচ্যুত হলে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে শাসকগণ সর্বদা ভীত থাকতেন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর সামনে একদিন হাজির হতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে ছোট বড় সবকিছুর জবাব দিতে হবে (নদভী, ২০১৯)। জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের মাধ্যমে। এতে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি আপনাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। তবে আমি আপনাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভাল কাজ করি, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি আমি অন্যায় কাজ করি, আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন।" তিনি আরো বলেন, "যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করতে আপনারা বাধ্য নন (ইবনু কাসীর, ২০২২)।"

১১) সরকারী কর্মচারীদের সীমিত ভাতা নির্ধারণ:

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত বেতন প্রদান করা হতো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক দিরহামও তাদের নেয়ার অনুমতি ছিলোনা। এক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো কর্মকর্তা নিজের জন্য ভাতা হিসেবে নির্ধারিত অংশও গ্রহণ করতেন না। বরং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিতেন। খলিফার উদাহরণ ছিল এতিমের অভিভাবকের ন্যায়। তিনি আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী হলে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বিরত থাকতেন। আর অভাবী হলে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে যতটুকু না হলে নয়-সে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন (নদভী, ২০১৯)।

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার খেলাফতকালে যে পরিমাণ ভাতা নিয়েছিলেন ইন্তেকালের আগে তা কোষাগারে ফেরত দিয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত ওমর (রা) দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত থাকার পরেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের জন্য কেবল দুটি কাপড়ই নিয়েছিলেন। এমনকি মুসলমানগণ তাঁর জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করতে চাইলে তিনি বলেন এই দুটি কাপড় ব্যতীত অন্য কিছুই তার জন্য বৈধ নয়। তিনি আরো বলেন, 'আমার ভরণপোষণ, আমার খাদ্য আমার পরিবারের ভরণপোষণ অন্য কোরাইশী লোকদের মতই। আমি তাদের থেকে গরীবও নই আবার ধনী ও নই। আর আমি তো মুসলমানদেরই একজন (হুসাইন, ২০১৭)। যদিও অন্যান্য সাহাবীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য ও পোশাক সংগ্রহ করতে পারেন এমন পরিমাণ ভাতা বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করেন এ শর্তে যে, স্বচ্ছল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা নেয়া বন্ধ করে দিবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ না করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেক খলিফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত অর্থকে জনগণের আমানত মনে করতেন। আর এতে প্রত্যেকেরই সমান হক রয়েছে। তাই ওমর (রা) সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের কেও বিলাস ও স্বাদ আস্বাদন হতে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন। কেননা তাদের সামান্য ভুল ত্রুটি সমগ্র মুসলিম জনতার চরিত্রে দুর্নীতির বীজ বপন করার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে (প্রাগুক্ত)।

১২) প্রতিহিংসা মূলক আচরণ পরিহার:

ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে, শাসক কর্তৃক শাসিতদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করা। এ আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় মহানবী (দ) সহ খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। দীর্ঘদিন যাবত নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করে মহানবী (দ) একটি আদর্শ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। এর ১০ বছর পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এসময় তিনি অত্যাচারী কুরাইশ কাফিরদের শাস্তি দেয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাননি। বরং সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মানব ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আঘাত না করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের ফলে তারা তাঁর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় ও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৩) গঠনমূলক সমালোচনা:

রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সাধনই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে কোন পরামর্শ যেমন গ্রহণ করা হতো তেমনি অন্যায় প্রতিরোধে শাসকের সমালোচনাকেও সমর্থন করা হতো। ফলে জনগণ নির্দ্বিধায় সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতো। এমনকি প্রয়োজনে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত প্রদান করা হতো। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)'র যুগে দুইজন সাহাবী আকরা ইবনে হারেছ এবং উয়াইনা ইবনে হাছান (রা) নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলে সরকারি কিছু খাস জমি তাদের জন্য বরাদ্দের আবেদন করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের ফরমান লিখে দিলেন এবং সেই ফরমানে উপস্থিত সাহাবাদের সাক্ষ্য দস্তখত রাখা হলো। সে সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই সে দুজন সাহাবী ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর স্বাক্ষর নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আসার পর দলিল দুটি তাঁর সামনে দেওয়া হলে তিনি তা পাঠ করার সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেলেন। এতে উভয় সাহাবী ভীষণ রাগান্বিত হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে নালিশ করলেন। খলিফার দরবারে এ বিষয়ে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হলে হযরত ওমর রাঃ

বললেন, 'খাস জমির মালিক সকল মুসলমান। সেখান থেকে কিসের ভিত্তিতে তাদের দান হিসেবে দেওয়া হবে?' খলিফার সামনে হযরত ওমর রাঃ এই ব্যাখ্যা দিলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন। এক্ষেত্রে তিনি আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে সত্য ন্যায় এব প্রতি আনুগত্য দেখালেন। কারণ হযরত ওমর রাঃ এর যুক্তি এবং বক্তব্য ছিল সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আর খলিফা সে সময় নিজের মর্যাদা সত্ত্বেও নিজেকে। সাধারণ নাগরিকের মত খলিফাকে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হত (হুসাইন ২০১৭)। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক খলিফার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক নিজের সিদ্ধান্ত বাতিল করা ছিল আদর্শ গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৪) নেতার আনুগত্য:

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়সঙ্গত নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সকল কর্মকর্তার জন্য আবশ্যক। এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। ফলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। হযরত ওমর (রা) বলেন, আনুগত্যের মাধ্যমেই রাষ্ট্র বা সংগঠন টিকে থাকে। আনুগত্য ছাড়া এর অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়না (হুসাইন, ২০১৭)। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা নির্বাচনের পরপরই সকল নাগরিক তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা নিজেদের স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। এমনকি প্রয়োজনে পদত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করতেননা। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) খেলাফতের দায়িত্ব পালনকালে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন ইরাক থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহর রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছ থেকে উপকৃত হতো এবং তাকে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। তাই তারা আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললো, তিনি যেনো খলীফা ওসমানের আদেশ উপেক্ষা করেন। এতে যতো রকম সমস্যা দেখা দেবে তা সমাধানে তারা নিজেদের বুক পেতে দেবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহ তা'য়ালা আনহু বললেন, যিনি আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্যের রশি

আমার গলায় বাঁধা। আমি চাই না আমার মাধ্যমে কোনো ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মোচিত হোক (হুসাইন, ২০১৭)।

১৫) জনস্বার্থ সংরক্ষণ:

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক হলো জনগণের সেবক। তিনি জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে পদত্যাগ করা তার জন্য আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেক শাসক এ সকল বিষয়াদি মাথায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মহানবি (দ) মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে জনস্বার্থ রক্ষায় যে উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন কালক্রমে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তা আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। হযরত ওমর (রা)'র দীর্ঘ ১০ বছরের শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্য একটি সুষ্ঠু জনকল্যানমুখী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। তিনি জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাতের অন্ধকারে মদিনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো তাদের প্রয়োজন পূরণে নিজেই তাদের গৃহে উপস্থিত হতেন। এমনকি সেবাপ্রদানে ত্রুটি হলে বা নিজে কোনো ভুল করলে আল্লাহ ও মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতেন। তিনি নিজে যেভাবে জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন তেমনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করতেন। দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে শোরাইক ইবনে শামি নামে মিশরের এক সামরিক অফিসার কৃষি কাজের অনুমতি চাইলে খলিফা তা নাকচ করে দেন। তথাপি তিনি মিশরে কৃষি কাজ শুরু করলে হযরত ওমর (রা) মিশরের গভর্ণরকে এ মর্মে চিঠি দেন যে, তিনি যেন শোরাইক কে মদিনায় পাঠান। শোরাইক মদিনায় আসলে খলিফা তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। ফলে তিনি খলিফার কাছে ক্ষমা চান এবং তওবা করেন। তার তওবার স্বীকৃতি সাপেক্ষে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে জনগণের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "যাও, তুমি মিশরে ফিরে যাও, নিজের সরকারি দায়িত্ব পালন করো (হুসাইন, ২০১৭)। "এভাবে অর্পিত দায়িত্বের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন করার সামান্যতম চেষ্টাকে প্রতিহত করার পাশাপাশি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তিনি সরকারি ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে আদমশুমারি প্রবর্তন, সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থার প্রচলন, পুলিশ

বাহিনী ও বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষার প্রসার সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এ জনকল্যানমুখী শাসনব্যবস্থা পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। আজও খলিফা ওমর (রা) প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গান করছে।

প্রচলিত গণতন্ত্র

আধুনিক যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের নাম উচ্চারিত হলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দৃষ্ট হয়না। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব এর মাধ্যমে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত করতে রাজতন্ত্রের বিপরীতে রিপাবলিক যুগের সূচনা হয়। যা গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির পথকে সুগম করে। তথাপি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার ২৩২ বছর পরও প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তির অধীন ভুয়া গণতন্ত্র অনুসারেই অধিকাংশ দেশ পরিচালিত হচ্ছে। অনেক দেশে তা প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা মূলত গণতন্ত্রের মুখোশে স্বৈরতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান প্রচলিত থাকলেও তা কার্যকরী নয়। উদাহরণস্বরূপ এ ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও তা মূলত ক্ষমতাসীন সরকারকে আইনি বৈধতা দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে না। আর এ ব্যবস্থাকেই গবেষকগণ ভুয়া গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ভুয়া গণতন্ত্রে যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরা সংবিধান ব্যবহার করেন নিজেদের সুবিধামতো; নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সংবিধানকে ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া করতে দ্বিধান্বিত হন না (রীয়াজ, ২০২৫)।

প্রচলিত ভুয়া গণতন্ত্রের ত্রুটি

প্রচলিত ভুয়া গণতন্ত্র ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি একপর্যায়ে তা রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে করায়ত্ত করে আইনের শাসনকে অকার্যকর করে তোলে। ফলে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের আশা- আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় না এবং ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র উক্ত দলের সমর্থক কতিপয় গোষ্ঠী শতভাগ ভোগ করে। এতে করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ একপর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবে এ প্রক্রিয়া একদিনে সম্পন্ন হয় না। বরং দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও জনগণের নিষ্ক্রিয়তা প্রথমে সক্রিয় গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ এবং সর্বশেষ এর চূড়ান্ত পতন ঘটায়। আর গণতন্ত্রের এই পশ্চাদপসারণ কয়েকটি ধাপে ঘটে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো, ক্ষমতা সংহত করা ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য নষ্ট করা, নির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও রাজনীতি করণ, তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে গণপরিষদের অবক্ষয় এবং কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দমন বা দূর করে নির্বাচনী কারসাজি (রীয়াজ, ২০২৫)। গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের উল্লেখিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্বৈরতন্ত্র আইনগত বৈধতা লাভ করেছে।

ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একাধিক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও আদর্শগত ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। উভয় গণতন্ত্রে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা, নিরঙ্কুশ নির্বাচন ব্যবস্থা, জনমত গ্রহণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দান, নৈতিকতার উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিধিবদ্ধ থাকলেও প্রচলিত গণতন্ত্রে এ সকল নীতি বহুলাংশে অনুসৃত হয়না। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্রে আদর্শ রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য শতভাগ অনুসৃত হতো। এ

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, জনস্বার্থ সংরক্ষণে যে কোন ধরণের পদক্ষেপ গৃহীত হতো। অপরদিকে প্রচলিত গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হয়।
ক্ষমতায় টিকে থাকার মানসে যেকোন ধরণের অপকর্ম এ গণতন্ত্রে অন্যায়ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। এমনকি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

- প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম দূর্বলতা হলো বিরোধী দলের অস্তিত্ব, যা ইসলামী গণতন্ত্রে অনুপস্থিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্বকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হলেও মূলত সরকারি দলের সাথে বিরোধী দলের বিরোধীতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে ইসলামী গণতন্ত্রে বিরোধী দলের পরিবর্তে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হতো। যেমন, হযরত আবু বকর (রা)' যুগে ওমর (রা) ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। আবার উমর (রা)'র যুগে আলী (রা) ছিলেন প্রধান বিচারক। এভাবে অন্যান্য খলিফার যুগেও এ প্রথা চালু ছিল। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপ্রধানকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে গঠনমূলক সমালোচনা করতেন। এ ধরণের পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনার ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরান্বিত হতো।

- ইসলামী গণতন্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য যা আধুনিক বিশ্বের গণতন্ত্রে অনুপস্থিত তা হলো, জবাবদিহিতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার ভয়ে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যেমন দুর্নীতি করতে পারতোনা একইভাবে বিচার বিভাগের সক্রিয়তার দরুণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির তিল পরিমাণ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পারতোনা। অপরদিকে সরকারী কর্মচারীদের স্বল্প বেতনের দরুণ তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা করতোনা। আবার অতিরিক্ত বেতন গ্রহণকেও নিজেদের জন্য বৈধ মনে করতোনা। তারা রাষ্ট্রীয় পদবীকে জনসাধারণের সেবা করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতো এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে যেতো। এমনকি কোনো স্থানে নিযুক্ত কর্মচারী যাতে দুর্নীতিপরায়ণ হতে না পারে সেজন্য গোয়েন্দা বিভাগের

মাধ্যমে সকল এলাকার কার্যাবলী তদারক করতো। পক্ষান্তরে প্রচলিত গণতন্ত্রে দলীয়করণের প্রভাব আইন প্রয়োগকারী বিভাগ সমূহেও বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ দেয়ার ফলে কার্যত প্রতিষ্ঠান দলের অধীন হয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে এবং ক্ষমতাসীন ব্যাক্তিরা থাকে বিচারের উর্ধ্বে। অপরদিকে সরকারী বেতন ও সুবিধাদি তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

- ইসলামী গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতা ও জনমত প্রকাশের চর্চা প্রচলিত গণতন্ত্রে অনুপস্থিত। প্রচলিত গণতন্ত্রে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলেও কার্যত জনমত প্রকাশের অধিকার হরণ করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়। বাক স্বাধীনতা হরণের উদাহরণ হিসেবে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা, হলুদ সাংবাদিকতার অবাধ প্রচলন, বিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আটক ও নির্যাতনসহ নানাভাবে হয়রানি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনকি কোনো কোনো দেশে প্রকৃত ইতিহাস সম্বলিত বই বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে তা বাজেয়াপ্ত করার নজিরও রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্রে জনসম্মুখে সরকারের সমালোচনা করার ও সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

- ইসলামী গণতন্ত্রে ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকে বিচারকের সামনে হাজির হওয়া প্রচলিত গণতন্ত্রে কল্পনাতীত। কেননা, প্রচলিত গণতন্ত্রে স্বয়ং বিচারকই কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আবার কখনো তিনি দলীয় নিয়োগে ক্ষমতাসীন হন। তবে এ ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ অকার্যকর হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক দেশের সকল প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগতকরণ।

- ইসলামী গণতন্ত্রের সাথে প্রচলিত গণতন্ত্রের বিরাট তফাৎ লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের আমানত বিধায় তা অন্যায়ভাবে গ্রাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে বক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়। এমনকি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার প্রধানের পারিবারিক সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও নামে বেনামে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সিংহভাগ ভোগ ও ক্ষেত্রবিশেষে পাচার করা হয়।

- ইসলামী গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়। এমনকি নিয়োগ প্রদানের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ সহ দায়িত্বে ইস্তফা দানকালে সম্পদের পরিমাণের হিসাব সংগ্রহ করা হতো। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা, স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়।

- সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে ইসলাম ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন জাতির অধিকার রক্ষায় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে যা মান্য করতে রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য ছিলেন। মদিনায় রাসুল (দ.) রাজনৈতিক যে স্বতন্ত্র মডেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজ অবধি সকল মুসলিম সরকারের কাছে মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে মদিনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, তার দ্বিতীয় কোনো নজির বিশ্বের ইতিহাসে আজ অবধি দেখা যায় না (খতিব, ২০২১)। পক্ষান্তরে মানবাধিকার লজ্ঘিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চীনের উইঘুর মুসলমানদের নির্যাতন, মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিধন, ভারতে মুসলিম নির্যাতন ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা ও ভাংচুর ইত্যাদি সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণের নিকৃষ্ট উদাহরণ।

- প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণে রাজনৈতিক দলগুলোর আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় যা তাদের ক্ষমতালিপ্সার বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থ জনগণের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়া যা আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত। আর এ গুরু দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হওয়া মানে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা ও বিচারের সম্মুখীন হওয়া।

এজন্যই সাহাবীরা হুকুমতের পদসমূহের ওপর পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন না; বরং তারা এসব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতেন এবং এর জিম্মাদারি তাদের শঙ্কিত করে তুলত। তাদের প্রত্যেকেই পিছু হটতেন এবং নিজেকে এই বোঝা-বহনের অনুপযুক্ত মনে করতেন। এরপরও যখন তারা কোনো জিম্মাদারি নিজের হাতে তুলে নিতেন, তখন তাকে লুটের মাল ভাবতেন না এবং তা গ্রাস করার জন্য এগিয়ে যেতেন না; বরং একে নিজের জিম্মায় অর্পিত এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মনে করতেন (রীয়াজ, ২০২৫)। তারা পদের প্রতি নির্লোভ ছিলেন আর ইসলামও পদের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিকে তা সমর্পণ করতোনা। অপরদিকে প্রচলিত গণতন্ত্রে ক্ষমতালিপ্সুরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনে দাঁড়ায় এবং ক্ষমতা লাভে মরিয়া হয়ে উঠে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রঙের দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? (সূরা বাকারা, ২: ১৩৮)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য সবকিছু থেকে একে আলাদা করে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে দেয় এক স্বতন্ত্র রূপ। আর এ কারণেই অন্য কোনোকিছুর সাথে মিশ্রিত করা হলে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্বকীয়তা হারিয়ে যায়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংখ্যায় অনেক, তবে এর সবগুলো মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত, আর তা হলো এর ঐশ্বরিক উৎস। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এসেছে সমস্ত সৃষ্টির রবের কাছ থেকে, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। এর সব উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সত্তাগতভাবেই এটি অপরিবর্তনীয়। এই ওয়ার্ল্ডভিউ বদলায় না, মানুষের অধিকার নেই এতে সংযোজন বা বিয়োজন করার। মানুষের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে একে গ্রহণ করে নিজেকে এর ছাঁচে বদলে নেওয়া এবং এর শিক্ষা প্রয়োগ করে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া।

ইসলামের কাঠামো প্রশস্ত। এ কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে আবার দিতে পারে বিকাশের প্রশস্ততাও।

মানুষের তৈরি ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম আর জীবনব্যবস্থাগুলো ক্রমাগত বদলায়। ওগুলো বদলাতে বাধ্য। মানুষের যখন চাহিদা বাড়ে, যখন তার প্রয়োজনের ধরন বদলায়, এই কাঠামোগুলো তখন তার কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। সে হাঁসফাঁস করতে থাকে। তখন নানা নিয়মনীতি বদলাতে হয়, অনেক সময় বদলে ফেলতে হয় পুরো ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম বা জীবনব্যবস্থাকেই। মানুষের সৃষ্টি সীমাবদ্ধ। মানুষের বানানো জীবনব্যবস্থা কিংবা ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, সময়, স্থান আর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মাথায় রেখে। এই সংকীর্ণতা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় মানুষের অজ্ঞতা, ত্রুটি, সংস্কার আর আবেগ-অনুভূতির কারণে। পরের প্রজন্মগুলোর কাছে আগেকার প্রজন্মের গড়ে তোলা ওয়ার্ল্ডভিউ, ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থাকে মনে হয় ত্রুটিপূর্ণ আর অপ্রাসঙ্গিক। তাই হালনাগাদ আর পরিবর্তনের ধারা ক্রমাগত চলতেই থাকে। অবস্থা এবং চাহিদার

পরিবর্তনের সাথে মানুষের সৃষ্টি খাপ খাওয়াতে পারে না, কারণ এগুলো আসমানি দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আলাদা। প্রকৃতিগতভাবেই এখানে পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি এটি তৈরি করেছেন, তিনি সব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত; সব অজ্ঞতা, ত্রুটি এবং অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে, তিনি মুক্ত সব সংস্কার এবং স্বার্থপরতা থেকে। স্থান ও কাল দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নন। এই ওয়ার্ল্ডভিউকে তিনি তৈরি করেছেন সব যুগ, অবস্থা আর মানুষের জন্য। এই কাঠামো কখনোই সংকীর্ণ হয়ে আসে না।

মহাবিশ্বের একটি বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। মানবজীবনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানবজীবন মহাবিশ্বেরই অংশ। তবে এই গতিশীলতা অনিয়ন্ত্রিত নয়। সুসংহতভাবে টিকে থাকতে হলে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। মানুষের জীবনকে মহাকাশের গ্রহগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় তৈরি হয়। একইভাবে মানবজীবনের যদি কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র, অক্ষ আর কক্ষপথ না থাকে, তাহলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর নাযিল করা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সূর্যের মতো, যাকে কেন্দ্র করে মানবজীবন আবর্তিত হয়। এই কক্ষপথের ভেতরে মানবজাতি চালিয়ে যেতে পারে তার বিকাশ, অগ্রগতি ও উন্নতি।

ইসলাম পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত। বাইরে থেকে খুচরো কোনো উপাদান কিংবা যন্ত্রাংশ আমদানি করার প্রয়োজন হয় না ইসলামের। তাছাড়া এটি যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, তাই অন্য উৎস থেকে আসা কোনোকিছুই এর সাথে খাপ খাবে না। নিখুঁত ও পরিপূর্ণ এই কাঠামোর মধ্যে নতুন কিছু যুক্ত করা বা এতে কোনো 'সংশোধন' আনার সক্ষমতা মানুষের নেই। এই ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের কাছে এসেছে নিয়ামাত হিসেবে। এটি এসেছে তার অন্তর, বুদ্ধিমত্তা, জীবন ও পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করতে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে তা মানুষের ভেতরে থাকা সম্ভাবনা আর ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলে; যাতে সেগুলো নষ্ট না হয় নিষ্ফল লক্ষ্যের পেছনে; যাতে আসমানি নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলোকে গঠনমূলকভাবে কাজে লাগানো যায়। এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য বাইরে থেকে কিছু ধার করতে হয় না। প্রয়োজন হয় না অন্য কোনো চিন্তা, দর্শন বা পদ্ধতির। নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সব উপাদান তার নিজের মধ্যেই আছে। আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে এমন এক

জীবনব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা মহাবিশ্ব এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গতি মহাবিশ্বের গতির সাথে সাংঘর্ষিক হয় না।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সামগ্রিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ। এটি মানবসত্তার সব অক্ষের মধ্যে ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য তৈরি করে। একইভাবে এটি মানবজাতির জীবনের সব দিক বিবেচনা করে। কারণ এটি সেই মহান সত্তার কাছ থেকে এসেছে যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ব্যক্তি, সমাজ এবং মানবজাতির জীবন নানা রকমের যেসব পরিস্থিতি অতিক্রম করবে, তার সবই মহান আল্লাহর কাছে জ্ঞাত। কোনোকিছুই তাঁর কাছ থেকে গোপন না। তিনি এই ওয়ার্ল্ডভিউ তৈরি করেছেন মানবজাতির জন্য সামগ্রিক কাঠামো হিসেবে, মানব জীবনে এবং মানবজাতির অস্তিত্বের সকল দিকের মধ্যে ভারসাম্যের জন্য। ইসলাম বাস্তবসম্মত এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই ওয়ার্ল্ডভিউ-ই একমাত্র প্রকৃত মাপকাঠি, যা দিয়ে যেকোনো সময়ে ও যেকোন স্থানে মানুষ তার মূল্যবোধ, সমাজ, জীবনব্যবস্থা, আচার-আচরণ, নৈতিকতা, সংস্কার এবং আইনকে যাচাই করতে পারে। এই মাপকাঠি দিয়ে সে বুঝতে পারে সত্যিই সে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী কি না। অতীত বা বর্তমানের এমন আর কোনো মাপকাঠি নেই, যা এভাবে ব্যবহার করা যায়। মানুষ কেবল এই ওয়ার্ল্ডভিউ থেকেই তার মূল্যবোধ এবং নীতি গ্রহণ করবে। তার মন ও মস্তিষ্ককে এর অনুগামী করবে, এর ছাঁচে গড়ে তুলবে নিজের চিন্তা ও আচরণ। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে মানবরচিত কোনো মতবাদ কিংবা ধর্মের মতো করে দেখা গুরুতর ভুল। মানবরচিত মতাদর্শ বা ধর্মের ক্ষেত্রে নানা উৎস থেকে নানা উপাদান গ্রহণ করে সমসাময়িক চিন্তাধারার আলোকে সেগুলোকে এক সাথে মেশানোর সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে সংযোজন, বিয়োজন এবং সম্পাদনার। কিন্তু ইসলামি

ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছুর প্রশ্নই আসে না। এই ওয়ার্ল্ডভিউ সামগ্রিক, নিখুঁত, পরিপূর্ণ।

ইসলামী জীবনব্যবস্থাতেই স্থিতিশীলতা

“কাজেই দ্বীনের প্রতি আপনার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করুন একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না”। (সূরা রুম, ৩০: ৩০)

ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার ফসল নয়। কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য তৈরি হয়নি। দুনিয়াবি কোনো লক্ষ্যে এর উদ্ভব হয়নি, ইসলাম প্রযোজ্য সর্বাবস্থায় এবং সর্বযুগে। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা, মানবজাতির জন্য নিয়ামাত ও রাহমাহ।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কিছু চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা আছে। সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক ও দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তন হয়। সমাজের রূপ ও ধরন বদলায়। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক 'উপাদান' এবং 'মূল্যবোধ' গুলো বদলায় না। এগুলো স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। এই ওয়ার্ল্ডভিউ একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথের মতো। ইসলামি সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তন হতে হবে এই চিরন্তন বাস্তবতাগুলোর কাঠামোর ভেতরে। এর অর্থ চিন্তা ও কাজের স্থবিরতা নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সমাজের পরিবর্তন ও গতিশীলতাকে কেবল বৈধতা দেয় না, অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করে। তবে শর্ত হলো এই পরিবর্তন হতে হবে ইসলামের কাঠামো এবং ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কক্ষপথের ভেতরে। একটি কেন্দ্রের চারপাশে, নির্দিষ্ট অক্ষ ও কক্ষপথের ভেতরে গতিশীলতার এই বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহর সব সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, একটু চিন্তা করলে যে কেউ এ বাস্তবতা বুঝতে পারবে। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

বস্তু-তা অণু হোক, অণুকে ভাঙার পর নিঃসৃত শক্তি হোক কিংবা অন্য কিছু, সবকিছুরই একটি স্থিতিশীল নির্যাস আছে। কিন্তু একই সাথে বস্তু সদা গতিময়, পরিবর্তনশীল।

অনুতে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে। প্রত্যেক গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথ থাকে, নির্দিষ্ট গতিপথ থাকে প্রত্যেক নক্ষত্রের। সবকিছু এক নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে গতিশীল।

আমরা জানি মহান আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ভেতর তাঁর পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করেছিলেন। মানুষের এই 'মানবতা', যা তাকে অন্য সব প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, একটি স্থায়ী বাস্তবতা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'মানবতা' বা 'মানবপ্রকৃতি' বিদ্যমান। জীবনে মানুষ বিভিন্ন পর্যায় ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ভ্রূণ থেকে শুরু করার পর এক পর্যায়ে মানুষ এসে পৌঁছায় বার্ধক্যে। বিভিন্ন সামাজিক পর্যায়ও অতিক্রম করে সে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ সম্মানিত অথবা অপমানিত হয় মানবতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের সাথে তার নৈকট্য অথবা দূরত্বের ভিত্তিতে। জীবনের পরিবর্তনগুলো তাকে তার স্থায়ী ও স্থিতিশীল মানবপ্রকৃতির নির্যাসের বাইরে নিয়ে যায় না। সহজাত কামনা, ক্ষমতা, সামর্থ্য সব অবস্থাতেই তার মধ্যে থাকে।

মানুষের মধ্যে তার পরিবেশকে বদলানোর, একে আরও উন্নত করার প্রবণতা কাজ করে। এটিও একটি স্থায়ী বাস্তবতা। এই প্রবণতার সম্পর্ক আছে মহাবিশ্বের মৌলিক গতিশীলতার সাথে। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে মানুষকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছে, এই প্রবণতা তারই ফসল। প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কাজে লাগাতে হয় সেগুলোকে। তাই এই প্রবণতা গেঁথে আছে মানুষের প্রকৃতির গভীরে। তবে স্থান-কাল ভেদে এই প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য হয়।

কাজেই মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দিকে নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায়। এটি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়েরও একটি বৈশিষ্ট্য। এই মৌলিক উপাদান ও মূল্যবোধগুলোকে ইসলামি জীবনব্যবস্থার অক্ষ ধরা যেতে পারে।

১. মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এ সবকিছুর আছে সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় অর্থ। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর চিরস্থায়ী হওয়া, তাঁর একত্ব, সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্বসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এই স্থায়ী বাস্তবতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ হলেন ইসলামি ব্যবস্থা ও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কেন্দ্র।

২. আরেকটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সত্য হলো—মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে থাকা সব বস্তু ও প্রাণী মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই এগুলোর উদ্ভাবক। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন বলেই এ সবকিছু অস্তিত্বে এসেছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর কারও, আর কোনোকিছুর অংশীদারিত্ব নেই। মহান আল্লাহর কোনো শরীক নেই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অংশের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনাতেও। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোতে একক।

৩. ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্য। বস্তু, প্রাণী এবং নবি-রাসুলগণসহ সব মানুষ মহান আল্লাহর দাস। মালিক তিনি একাই। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবাই এবং সবকিছু তাঁর গোলাম। মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক দাসত্বের।

৪. ঈমান ছাড়া কাজ অর্থহীন, ঠিক যেমন আমল ছাড়া ঈমান হয়ে পড়ে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। নেক আমলের শর্ত হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ রাসুলগণ, কিয়ামাত এবং তাকদীরে বিশ্বাস। কোনো কাজ মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার শর্ত ঈমান। ঈমান ছাড়া কাজ অর্থহীন, মূল্যহীন, প্রত্যাখ্যাত।

৫. মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বাস কিংবা জীবনব্যবস্থা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। ইসলামের অর্থ এক আল্লাহর ইবাদাত করা, মহান আল্লাহর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা, সন্তুষ্ট মনে তাঁর হুকুমের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা এবং মানবজীবনের সব দিক পরিচালিত করা তাঁর নির্ধারিত শারীআ অনুযায়ী। মহান আল্লাহ ইসলাম এবং শুধু ইসলামকেই মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কারণ তাকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যার বস্তুগত মূল্য মানুষের চেয়ে বেশি। এমন কিছু নেই, যার জন্য মানুষকে বিসর্জন দেওয়া যায়।

৭. সব মানুষ একই উৎস থেকে এসেছে, এ দিক থেকে সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে সম্মান ও অবস্থানের পার্থক্য হয় ঈমান, তাকওয়া এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। সম্পদ, জাতীয়তা, শ্রেণি, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ কিংবা জন্মস্থানের মতো বিষয়গুলোর কারণে কেউ কারও ওপর প্রাধান্য পাবে না।

৮. মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর ইবাদাত করা। ইবাদাত করার অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। পূর্ণ আনুগত্যের শর্তের মধ্যে

আছে জীবনের ছোট-বড় সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এবং কেবল তাঁরই নির্দেশ মেনে চলা। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি হৃদস্পন্দন তাঁর ভালোবাসায়, তাঁরই জন্য নিবেদনের চেষ্টা করা।

৯. মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো ঈমান এবং আল্লাহর নির্ধারিত পথের অনুসরণ। জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, বর্ণ পরিচয়, জাতীয়তা, আঞ্চলিক পরিচয়, শ্রেণি পরিচয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা অন্য কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য-সম্পর্কের ভিত্তি নয়।

১০. দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষা। এ পরীক্ষা বিশ্বাস ও আমলের। আখিরাতের জীবন হলো হিসাব ও প্রতিদানের। দুনিয়াতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব রাখা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি উচ্চারণ, ভালো-মন্দ যেকোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিক্রিয়া। আর এ সবকিছুর হিসেব নিয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন মহান আল্লাহ, যিনি সর্বোচ্চ বিচারক।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই সবগুলো উপাদান ও মূল্যবোধ স্থায়ী। এগুলোতে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের জীবন ও জীবনধারা এই অপরিবর্তনীয় কাঠামোর সাপেক্ষে গতিশীল থাকবে। এই স্থায়ী উপাদান ও মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে ইসলামি সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, সমাজের সব ধরনের সম্পর্কের মধ্যে, জীবনকে সংগঠিত করার সব প্রচেষ্টায়। এই মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে, সব ধরনের পরিবেশে, সব ধরনের প্রেক্ষাপটে।

একটি সমাজ যত বিস্তৃত হতে থাকে, এই মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ ও উপায় তত বাড়তে থাকে। মানবীয় জ্ঞানের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়, তত বাড়ে ইসলামের স্থায়ী মূল্যবোধগুলোর প্রকাশভঙ্গি। নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গি তৈরি হয়, কিন্তু সেগুলোকে চালিত করে স্থায়ী মূলনীতিগুলো। মূলনীতিগুলো অপরিবর্তিত থাকে।

সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মাপকাঠির গুরুত্ব আজকের মতো আর কখনো এত তীব্র ছিল না। আধুনিক মানুষ সব ধরনের নীতি ত্যাগ করেছে। কক্ষচ্যুত হয়ে আজ মানবজাতি এলোমেলো ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের অবস্থা ওই গ্রহের মতো, যে ছিটকে বেরিয়ে গেছে নিজের কক্ষপথ থেকে। তীব্রগতিতে সে ছুটে যাচ্ছে অন্য কোনো গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের সাথে ভয়ংকর সংঘর্ষের দিকে। যে সংঘর্ষে সে নিজে তো ধ্বংস হবেই, সেই সাথে ধ্বংস করবে তার গতিপথে থাকা সবকিছু। মহান আল্লাহ বলেছেন,

“সত্য যদি তাদের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হতো, তাহলে আকাশ পৃথিবী আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে, সব লন্ডভন্ড হয়ে যেত। (তাদের কামনাবাসনার) বিপরীতে আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের জন্য উপদেশবাণী। কিন্তু তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে”। (সূরা মুমিনূন, ২৩:৭১)

কোটি কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, আরও কোটি কোটি মানুষকে বানানো হয়েছে উৎপাদনের যন্ত্র। সমাজের সব নিয়ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। বিসর্জন দেওয়া হয়েছে নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকতা আর মূল্যবোধ। কেন? যাতে অল্প কিছু মানুষ-সুদখোর, বিনোদন আর সস্তা সুখের ফেরিওয়ালা এবং ক্ষমতার সওদাগরেরা আরও ধনী হতে পারে।

ক্রমপরিবর্তনশীল খেয়ালখুশির অনুসরণ কেবল মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে না, বরং তা প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের জন্যও হুমকি। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্থায়ী বাস্তবতা ও অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধগুলো নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সমাজের গতিশীল থাকাকে নিশ্চিত করে। মানুষের চিন্তা এবং কাজকে নিরাপদ রাখে খেয়ালখুশি থেকে তৈরি বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে।

এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি চিন্তা ও সমাজকে ওই ধরনের উন্মত্ততা থেকে রক্ষা করে, যা মার্ক্সবাদী চিন্তা এবং সমাজকে আজ গ্রাস করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বিশাল একটা অংশ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থান থেকে মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু পরিবর্তন আর প্রগতির বিশ্বাসের ফলে তৈরি হওয়া অসুখ আক্রান্ত করেছে তাদেরকেও। যেদিন থেকে পশ্চিমা চিন্তা ও সমাজ বিশ্বাসের নোঙর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইদিন থেকেই এই উন্মত্ততা তাদের মনে বাসা বেঁধেছে।

বিশ্বাস ও মূল্যবোধের স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য মুসলিম বিবেক এবং সমাজে প্রশান্তির অনুভূতি তৈরি করে। এই অনুভতি জন্ম নেয় মজবুত কাঠামো আর নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে। একজন মুসলিম জানে তার প্রতিটি পদক্ষেপ এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। সে জানে তার জীবনের গতি যুক্ত আছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে। সে বোঝে তার জীবন ও কাজগুলোর অর্থ আছে। মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী বিকাশ ও আত্মিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় সে।

ইসলামি মূল্যবোধসমূহ স্থায়ী হবার অর্থ হলো-এটি সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতিমালা দেয়, যা শাসক ও জনগণ, উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসক চাইলেই যেকোনো আইন বানিয়ে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলিমের

আল্লাহপ্রদত্ত কিছু মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব কোনো শাসক কিংবা বিচারকের নেই। সব মুসলিম শারীআর নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। কোনো শাসকের অধিকার নেই ইসলামের মৌলিক উপাদান এবং মূল্যবোধগুলো বদলানোর। তাদের অধিকার নেই জুলুম আর লুটপাট ভুলিয়ে রাখতে কামনাবাসনা আর শারীরিক সুখের নেশার দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করার।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী মানুষের জীবনে সম্ভাব্য অবস্থান দুটো-হিদায়াত অথবা গোমরাহি, আলো অথবা অন্ধকার, হক অথবা বাতিল, আল্লাহর আনুগত্য অথবা খেয়ালখুশির আনুগত্য, ইসলাম অথবা জাহিলিয়াত, ঈমান অথবা কুফর। প্রত্যেক সময়, স্থান এবং পাত্রের জন্য এ কথা সত্য। বিচ্যুতির ধরন অসংখ্য হতে পারে। অন্ধকারের থাকতে পারে নানা সংস্করণ। বাতিলের রূপ অনেক হতে পারে। তৈরি হতে পারে খেয়ালখুশির অনুসরণের নতুন নতুন পদ্ধতি। জাহিলিয়াতের কাঠামো বদলাতে পারে, কুফরের চেহারা বদলাতে পারে-কিন্তু এই মৌলিক সত্য অপরিবর্তিত থাকে। মানুষ হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করে অথবা জাহিলিয়াতের অন্ধকারে খেয়ালখুশি, কামনাবাসনা, বিচ্যুতি ও কুফর অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

অতঃপর (হে নবি!) আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা জাসিয়া, ৪৫: ১৮)

ইসলামি জীবনব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে চিন্তা, ওয়ার্ল্ডভিউ, কর্ম, সমাজ ও শাসন মহান আল্লাহর নির্ধারিত সুস্পষ্ট সীমানার ভেতরে প্রাণবন্তভাবে চলাচল করতে পারে। মানুষ সুস্থ বিকাশে সাড়া দিতে পারে তখন।

স্থিতিশীলতার কারণে ইসলামি চিন্তাধারা আত্মায় মজবুতভাবে গেঁথে যায়। দ্বীনের তৈরি কাঠামোর সাহায্যে মুসলিম সমাজ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই কাঠামোতে সুযোগ থাকে বিভিন্ন চিন্তা, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রগতির। খ্রিষ্টীয় চার্চের মতো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সমাজকে লোহার খাঁচায় বন্দি করে না। আবার আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মতো সমাজকে সব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, যার ফলে মানুষ

মহাকাশে এলোমেলো ছুটে চলা ধূমকেতু কিংবা আতঙ্কিত ছত্রভঙ্গ পশুর মতো হয়ে যায়। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এই ছত্রভঙ্গ ছুটোছুটির উদাহরণ।

স্থিতিশীলতার এই বৈশিষ্ট্যই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মুসলিম সমাজকে সুসংহত ও শক্তিশালী রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে অনেকবার মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল, রক্তাক্ত ও প্রকম্পিত হয়েছিল, পরাজিতও হয়েছিল সাময়িকভাবে। তবু উম্মাহ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বারবার। কিন্তু উম্মাহ যখন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পরিপূর্ণতা, স্থায়িত্ব এবং অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে সন্দিহান হতে শুরু করল, তখনই শুরু হলো উম্মাহর সত্যিকারের দুর্বলতা এবং পতন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শত্রুরা ইসলামি চিন্তাকে সরিয়ে রেখে পশ্চিমা ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে আমাদের প্রলুব্ধ করল। [হাল নাহনু মুসলিমুন?]

ক্রমপরিবর্তনশীল ধ্যানধারণার পেছনে ছুটে চলা সমাজের মজবুত কোনো ভিত্তি থাকে না। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সীমিত ও অনুমাননির্ভর, প্রকৃতিগতভাবেই। তাই মানবীয় চিন্তাভাবনার ওপর গড়ে ওঠা ব্যবস্থাকে নির্ভর করতে হয় অনুমান, জল্পনাকল্পনা আর ক্রমপরিবর্তনশীল নানা তত্ত্বের ওপর। এধরনের সমাজ ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে অনুমাননির্ভর জ্ঞান অথবা ক্রমাগত বদলাতে থাকা খেয়ালখুশিকে। এই মিথ্যা ইলাহদের সাপেক্ষে সমাজ তার মূল্যবোধ আর মাপকাঠি তৈরি করে। এধরনের সমাজ বিভ্রান্ত চিন্তা, বিক্ষুব্ধ বিবেক, আর পরিশ্রান্ত, রোগাক্রান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে এলোমেলোভাবে। কারণ এর পুরো ভিত্তি গড়ে উঠেছে ক্ষণস্থায়ী মরীচিকার ওপর। ঠিক এ ব্যাপারটাই ইউরোপের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাধ্যমে এই অসুস্থতা পুরো মানবজাতিকে আজ গ্রাস করেছে। পৃথিবীর সব সমাজ আজ পথ হারিয়েছে মরুপ্রান্তরে। [আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা]

তাই স্থায়ী মূল্যবোধ এবং মূলনীতি প্রয়োজন। আর তা আসতে হবে একটি ধ্রুব উৎস থেকে। যে উৎসের কাছে বাস্তবতার সম্পূর্ণতা স্পষ্ট। যে উৎসের জ্ঞান দৃঢ় ও পরিপূর্ণ। সব দিক ও ক্ষেত্র যার জানা। পথের কোনো বাঁক, মোড়, গর্তও যার কাছে অজানা নয়। এই মূল্যবোধ ও নীতি আসতে হবে এমন এক উৎস থেকে, যা মানবীয় অনুভূতি, অনুরাগ-বিরাগ কিংবা কামনাবাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না, খেয়ালখুশি অনুযায়ী যার সিদ্ধান্ত বদলায় না, যার গতকালকের সিদ্ধান্ত আজ ভুল প্রমাণিত হয় না। এমন উৎস থেকে আসা ওয়ার্ল্ডভিউ প্রতিষ্ঠিত হলে সেই নির্ধারিত কাঠামো ও সীমানার ভেতরে পরিবর্তন, বিকাশ, উন্নতি এবং প্রগতিতে সমস্যা থাকে না। নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে

নির্দিষ্ট কক্ষপথের চালিত হবার কারণে এ সবই তখন নিরাপদ, স্বাভাবিক এবং কাম্য হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে গতি ও পরিবর্তন হয় আলোকিত এবং সুবিন্যস্ত, উদ্দেশ্য হয় মহৎ আর অগ্রগতি হয় দৃঢ়, দৃপ্ত এবং ঋজু পদক্ষেপে। সেই ওয়ার্ল্ডভিউ মানবসমাজের জন্য একটি স্থিতিশীল, অর্থবহ এবং সংগতিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। আমরা যদি নিছক অন্য কোন সংস্কৃতি, মানুষের চিন্তা ও কর্মের আরেকটি সমন্বয় হিসেবে না দেখে, ইসলামকে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান হিসেবে দেখি; যে বিধান সব যুগ, সব স্থানের জন্য প্রযোজ্য-তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে বাধ্য। ইসলামি সংস্কৃতি যদি ওহির অনুসরণের ফসল হয়, তাহলে কোনোভাবেই অন্য সংস্কৃতিগুলোর মতো একে স্থান ও কালের শেকলে বাঁধা যাবে না। কোনো অঞ্চল বা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না ইসলামকে।

আমাদের কাছে যেটাকে ইসলামের ক্ষয় মনে হচ্ছে, আসলে সেটা আমাদের নিজেদের অন্তরের মৃত্যু আর শূন্যতা। আমাদের অলস, স্থবির হৃদয়গুলো চিরন্তনের আহ্বান শুনতে পায় না। মানবজাতি ইসলামকে অতিক্রম করে গেছে, ইসলামের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে -এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক মানুষ নৈতিকতার এমন কোনো কাঠামো তৈরি করতে পারেনি, যা ইসলামের চেয়ে উত্তম। আধুনিক সভ্যতা 'উম্মাহ'-এর মতো ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তবসম্মত কোনো ধারণা পেশ করতে পারেনি। আধুনিক মানুষ এমন কোনো সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে পারেনি, যা ইসলামের মতো সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতকে ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে পারে। আধুনিক সভ্যতা মানুষের সম্মান, নিরাপত্তার অনুভূতি, আত্মিক আশাবাদ এবং অবশ্যই মানুষের সুখ বাড়াতে পারেনি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতার অর্জন ইসলামের সামনে ম্লান হয়ে যায়। তাহলে কীসের ভিত্তিতে বলা হবে, ইসলাম সেকেলে? ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম। আর ধর্ম ও ধার্মিকতাকে আজ বেমানান, সেকেলে মনে করা হয়, এটাই কী কারণ? কারণ হিসেবে এটা কি যথেষ্ট?

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলাম যে জীবনব্যবস্থা বা দ্বীন দিয়েছে, তা মানুষের বানানো যেকোনো ব্যবস্থার চেয়ে বেশি মজবুত, পরিপূর্ণ এবং মানবপ্রকৃতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাজারো প্রস্তাবনা সংস্কারের পরও এর ধারেকাছে পৌঁছাতে পারেনি মানবরচিত কোনো ব্যবস্থা।

ইসলামি সভ্যতার অর্জনগুলোর দ্বারা ইসলাম সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ এই অর্জনগুলো বাস্তবায়িত হবার বহু আগেই ইসলাম এগুলোকে কাম্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। একইভাবে মানবীয় বিকাশের ত্রুটি, বিচ্যুতি আর চোরাবালিগুলোও ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করে। মানুষ এই ভুলগুলোকে চিনতে পারার বহু আগেই ইসলাম মানবজাতিকে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিল। বিশ্বাসের কথা সরিয়ে রেখে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিচার করলেও ইসলামের বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা অনুসরণের যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়।

অনেক মুসলিম মনে করে ইসলামের 'সংস্কার' প্রয়োজন। না ইসলামের কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ইসলাম নিখুঁত। সংস্কার দরকার ইসলাম নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর মনোভাবের। সংস্কার দরকার আমাদের স্থবিরতা, অলসতা, অহমিকা আর অদূরদর্শিতার। ত্রুটি আমাদের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে নয়।

আত্মিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামের 'উন্নতি' করা সম্ভব নয়। বরং ইসলামি ধারণা অথবা ইসলামের সামাজিক শিক্ষার মধ্যে যেকোনো পরিবর্তনের অর্থ হলো এর মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটানো। যা বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষাকে নষ্ট করবে, ধ্বংসাত্মক হবে এবং একসময় গভীর অনুশোচনার জন্ম দেবে। পরিবর্তন প্রয়োজন, তবে সেই পরিবর্তন প্রয়োজন আমাদের নিজেদের মধ্যে। পরিবর্তন হতে হবে ইসলামের দিকে, ইসলাম থেকে সরে গিয়ে নয়। [Islam at the Crossroads (১৯৫৫),- মুহাম্মাদ আসাদ]

ইসলামের সাথে পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তার মিশ্রণের কারণে ক্ষতি শুধু মুসলিমদের হবে না, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো মানবজাতি। এধরনের মিশ্রণের অর্থ হবে মানবজাতির বিষাক্ত চিন্তা দিয়ে দূষিত করে ফেলা। মানুষ আজ এলোমেলো চিন্তার দমকা বাতাসে উদ্দেশ্যহীনভাবে কাঁপছে। জলে ও স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের অপরাধের ফলে। দিকভ্রান্ত মানবজাতির সামনে ইসলামই একমাত্র দৃঢ়, মজবুত হাতল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই বিশুদ্ধ, নিখুঁত দিকনির্দেশনা ছাড়া মানুষের সামনে আর কোনো আশ্রয় নেই। প্রগতি আর সংস্কারের নামে, 'মধ্যযুগের সেকেলে ঐতিহ্য' ছুড়ে ফেলার নামে কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে যারা মানবজাতির এই শেষ আশ্রয়কে নষ্ট করতে চায়, তারাই মানবজাতির প্রকৃত শত্রু। শুধু মুসলিম নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির উচিত এদের প্রত্যাখ্যান করা এবং ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলা।

প্রগতিশীলতা বনাম প্রতিক্রিয়াশীলতার যে বিতর্ক তারা তৈরি করার চেষ্টায় রত, বাস্তবতা হলো তারা আজও অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকদের ফেলে আসা বুদ্ধিবৃত্তিক খড়কুটো কুড়িয়ে খাচ্ছে। তারা এখনো ঠিকঠাক বিংশ শতাব্দীতেই এসে পৌঁছাতে পারেনি। তারা জানেও না যে, মার্ক্সবাদ, ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিসম আর ডারউইনবাদসহ যেসব মতাদর্শের পূজো তারা করে, খোদ ইউরোপেই সেগুলোর বিপরীতে বিভিন্ন ধ্যানধারণার আবির্ভাব ঘটে গেছে বহু আগেই। নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করলেও তারাই আসলে প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলামের সত্যের প্রতি ফিরে যাওয়ার দায়িত্বকে উপলব্ধি করলেই কেবল সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব। তিন শতাব্দী ধরে মানবজাতি বিভ্রান্ত। অনেক ধোঁকা, ধাক্কা আর কষ্টের পর মানুষ আজ ক্লান্ত। মানবজাতির প্রয়োজন ইসলামের ছায়াতলে নিশ্চয়তা, সান্ত্বনা আর আত্মিক প্রশান্তির।

ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে পশ্চিমা চিন্তা যে বিপর্যয়গুলোর সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর কারণে তারা বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে আজও ঘুরে ফিরছে, মহান আল্লাহ তা থেকে আমাদের হেফাযত করেছেন। আজ যদি আমরা নিজেরাই বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ছুড়ে ফেলে সেই গোলকধাঁধায় ঝাঁপিয়ে পড়ি, তবে তা হবে সবচেয়ে বড় মূর্খতা। সবচেয়ে জঘন্য নির্বুদ্ধিতা। পুরো মানবজাতিকে এধরনের নির্বুদ্ধিতার মাশুল দিতে হবে। কারণ এর ফলে আমরা সেই বিশুদ্ধ উৎসকে হারিয়ে ফেলব, যার মাধ্যমে মানবজাতি আজকের এই দুর্দশা আর ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্তি ও মুক্তি খুঁজে পেতে পারে।

মানবজাতি আজ অত্যন্ত গুরুতর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এই বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখানোর দায়িত্ব আমাদের, মুসলিমদের। আমাদের উপলব্ধি করা দরকার এই দায়িত্বের ভার ও গুরুত্ব।

পৃথিবীতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা

مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ

পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। (সূরা মূলক, ৬৭:৩)

দ্বীন ইসলাম নাযিল হয়েছে এক বিশেষ ধরনের উম্মাহ গড়ে তোলার জন্য। এমন এক উম্মাহ, যা মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাবে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীতে। এই উম্মাহ মানবজাতিকে মুক্ত করবে বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, কলুষিত নেতৃত্ব, মিথ্যে আদর্শ আর মতাদর্শের কবল থেকে। মানবজাতি আজ দুর্দশাগ্রস্ত। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে একজন মুসলিম এই বিশেষ উম্মাহর অগ্রগামী সদস্যে পরিণত হয়। এমন সদস্য যে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে বর্তমান অন্ধকার থেকে।

মুসলিমদের জীবনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ইসলামি আকীদা, ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এগুলো থেকে গড়ে উঠা ইসলামি জীবনব্যবস্থা। অস্তিত্বের এই সামগ্রিক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে কুরআন। মানবপ্রকৃতির কোনো দিক, কোনো অক্ষ সেখানে বাদ যায় না। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ইন্দ্রিয় এবং অন্তর্দৃষ্টির মতো বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় সেখানে। আলোচিত হয় বস্তুজগৎও। এই সব দিকগুলোর ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান ও দিকনির্দেশনা মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এই দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের মালিক, মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের জীবনকে গড়ে নিয়েছিলেন সরাসরি কুরআন থেকে নেওয়া এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আঙ্গিকে। তাঁরা একে গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে। এক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য। তাঁদের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে আর কোনো প্রজন্ম এই ওয়ার্ল্ডভিউকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। আল্লাহ তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন, বসিয়েছিলেন মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে। মন ও মস্তিষ্ক, সমাজ ও শাসন-প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক ব্যবস্থা তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, যার কোনো তুলনা, যার কাছাকাছি কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে এর আগে কিংবা পরে পাওয়া যায় না। এই প্রজন্মের দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস ছিল কুরআন। তাঁরা ছিলেন কুরআনের প্রজন্ম। রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

ইসলামের শিক্ষা ও উপাদানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বিদ্যমান। ভারসাম্যের এই বৈশিষ্ট্য ইসলামের সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। ইসলামের সামগ্রিকতা ভারসাম্যপূর্ণ। ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে চরমপন্থা, পরস্পর বিরোধিতা এবং বাহ্যিক প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছে। অন্যান্য দার্শনিক কিংবা ধর্মীয় ধারণাগুলো বিকৃত হয়েছিল এসব কারণেই। এর মধ্যে অধিকাংশ শুরু থেকেই ভুলের ওপর গড়ে উঠেছিল। অল্প কিছু (যেমন ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম) একসময় সঠিক অবস্থানে থাকলেও মানুষের সংযোজন-বিয়োজন আর ভুল ব্যাখ্যার কারণে সেগুলোও বিকৃত হয়ে গেছে পরে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কিছু কিছু দিক আছে যেগুলো স্ব-প্রমাণিত। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এগুলোকে সত্য হিসেবে চিনতে পারি। এগুলোর সত্যতা নিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। আবার ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এমন কিছু দিক আছে, যেগুলো নিয়ে প্রয়োজন আলোচনা ও গবেষণার। এই দিকগুলো দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হয়। দ্বীন ইসলামের এ দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য মানবপ্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করে।

অস্তিত্বের সব রহস্যের নাগাল মানুষের বৃদ্ধিমত্তা পায় না, সেগুলোর সবকিছু পরোপুরি বোঝার সক্ষমতা তার নেই। মানুষের বৃদ্ধিমত্তাকে মহান আল্লাহ এমনভাবে তৈরি করেছেন, যাতে সে যা জানতে পারে এবং যা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। অজানাকে নিয়ে কৌতহল আর জানার মাধ্যমে সন্তুষ্টি: মানব চরিত্রে এ দুইয়ের মধ্যে একধরনের ভারসাম্য আছে। ঠিক যেমন ভারসাম্য আছে অস্তিতের প্রকৃতির ব্যাপারে, যা জানা সম্ভব আর যা জানা সম্ভব না; তার মধ্যে। মানবচরিত্রের মধ্যে থাকা ভারসাম্য, অস্তিত্বের মধ্যে থাকা ভারসাম্যের প্রতিফলন।

যে বিশ্বাসব্যবস্থায় মানুষের সীমিত বুঝকে অতিক্রম করে যাবার মতো কোনো উপাদান নেই, তাকে আসলে বিশ্বাস বলা যায় না। এমন বিশ্বাসের প্রতি মানবাত্মা খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে না। কৌতূহলকে জাগ্রত করা অথবা মানুষের ভেতরে রহস্যকে জানার যে আকুলতা কাজ করে, তা সন্তুষ্ট করার মতো কিছুই এমন বিশ্বাসব্যবস্থায় থাকে না। অন্যদিকে, কোনো বিশ্বাস যদি পরস্পরবিরোধী হয়, এত গভীরভাবে রহস্যে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয় যে তা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বিহ্বল করে ফেলে-সেক্ষেত্রে মানুষের মন তা বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষের প্রয়োজন এমন আকীদা, যা তার চিন্তাকে আলোকিত করবে; কিন্তু পরস্পরবিরোধী হবে না অথবা তাকে ধাঁধায় ফেলে দেবে না।

মানুষের মন এমন কিছু চায়, যা বোঝার পর কাজে পরিণত করা সম্ভব। এমন বিশ্বাস, যা প্রয়োগ করা যায় বাস্তব জীবনে।

একটা সামগ্রিক বিশ্বাসব্যবস্থায় এদুটো দিক সঠিক মাত্রা এবং পরিমাণে থাকতে হয়, যাতে এর মধ্যে মানুষ তার নিজের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা আর সম্ভাবনার সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। ইসলামি বিশ্বাসে এমন কিছু দিক আছে, যেগুলোর বাস্তবতা বোঝা মানুষের পক্ষে পুরোপুরিভাবে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর জাত, তাকদীর, রূহের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান সবসময় সীমিত থেকে যাবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছে অনুযায়ী সৃষ্টি করার সামর্থ্য-মানুষের পক্ষে একটা মাত্রা পর্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা সহজাতভাবে স্রষ্টার মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার আবশ্যকতা বুঝতে পারে। কোনো সত্তাকে যদি স্রষ্টা হতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই এই গুণগুলোর অধিকারী হতে হবে। আর স্রষ্টার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার প্রমাণ ইসলাম আমাদের দেয়।

ইসলাম মহাবিশ্ব এবং এর উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার কথা জানায়। মহাবিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা জানায়। জানায় প্রাণ ও প্রাণের বিভিন্ন ধরন এবং মহাবিশ্ব আর স্রষ্টার সাথে প্রাণের সম্পর্কের ব্যাপারে। ইসলামে আছে মানুষ ও তার প্রকৃতির ব্যাপারে শিক্ষা। আছে মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরকারি সঠিক জীবনব্যবস্থা। এসব শিক্ষা ইসলাম উপস্থাপন করে স্পষ্ট, যৌক্তিক ও সহজভাবে। এই শিক্ষাগুলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। মানুষ সহজাতভাবে তা গ্রহণ করে নেয়। কুরআনে এসেছে,

তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না। (সূরা তূর, ৫২:৩৫-৩৬)

যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (আবার) সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৮১-৮২)

বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি!' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ নাকি তারা; যাদেরকে শরীক তারা করে? নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন

আসমানসমূহ ও জমিন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি? তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে। নাকি তিনি, যিনি জমিনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের পূর্বক্ষণে শুভবার্তাবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে (আল্লাহর) শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযক দান করেন? বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।' (সূরা নামল, ২৭: ৫৯-৬৪)

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে। তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভীতি ও ভরসা সঞ্চারীরূপে। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য,

যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে-তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন, তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ : ২০-২৫)।

এই আয়াতগুলোতে মানুষ এবং মহাবিশ্বের ব্যাপারে বেশ কিছু অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। সৃষ্টির মাঝে থাকা এই নিদর্শনগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেছেন। কুরআনের এধরনের আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, মহান আল্লাহর ইচ্ছা চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। মানবীয় যুক্তি অনুযায়ী আমাদের কাছে অনেক কিছু আবশ্যিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে, তাঁর ইচ্ছা বা কাদরের ক্ষেত্রে মানবীয় যুক্তি বা যৌক্তিক আবশ্যকতাগুলো প্রযোজ্য নয়।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃশ্যমান ও গায়িবের জগৎ-ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউতে এমন প্রতিটি দিক বিদ্যমান, যা মানবপ্রকৃতিকে অনুরণিত করে। মানুষের চিন্তা কিংবা দৃষ্টি অদৃশ্যজগতের নাগাল পায় না। ধরাছোঁয়ার বাইরের এই জগৎ মানুষের মধ্যে মহান স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের অনুভূতি তৈরি করে। অন্যদিকে দৃশ্যমান জগতে মানুষ পায় তার আকাঙ্ক্ষার খোরাকি। এ জগতে সে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে তার নিজের মূল্য এবং সম্মানিত অবস্থানের উপলব্ধি তৈরি করে এ জগৎ। এভাবে মানুষ খুঁজে পায় ভারসাম্য।

মহান আল্লাহর ক্বাদর চূড়ান্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কিছু স্থিতিশীল নিয়ম আছে, যা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভারসাম্যের আরেকটি দিক। মহান আল্লাহ যা ইচ্ছে, তা করেন। যখন ইচ্ছে, তখনই করেন। তাঁর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাঁকে বাঁধা দেওয়ার মতো নেই কেউ। তবে এটাও সত্য যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছার এমন কিছু রীতি আছে, যেগুলোর কার্যকরণ আমাদের কাছে স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এগুলোকে বলে মহাবিশ্ব বা প্রকৃতির নিয়ম। মুমিন এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এগুলোর সাপেক্ষে পরিচালিত করতে পারে জীবন ও সমাজকে। তবে পুরো সময়টা তার চিন্তা ও অনুভূতিতে এই উপলব্ধি দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে-মহান আল্লাহর ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যেকোনো কিছু করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান, তা-ই করেন। তিনি চেয়েছেন বলেই সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন কিছু নিয়ম দান করেছেন, যেগুলো মানতে মানুষ বাধ্য। কিন্তু

মহান আল্লাহ নিজে এই নিয়মগুলো দ্বারা আবদ্ধ নন। চাইলে তিনি এই নিয়ম রহিত করতে পারেন, বদলে দিতে পারেন, ঘটাতে পারেন নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু। মহান আল্লাহ সব নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি নিয়ম তৈরি করেন, নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। তিনি চিরন্তন ও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী।
এ কারণেই মহাবিশ্বের মধ্যে বিরাজমান নানা নিয়ম ও প্রক্রিয়ার প্রতি আল্লাহ আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন বারবার। কুরআনে এগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে মহাবিশ্ব এবং এর ব্যবস্থাপনার ওপর মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ হিসেবে। একদিকে এগুলো সৃষ্টির মাঝে থাকা আল্লাহর নিদর্শন, অন্যদিকে এ নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলো বোঝা মানুষের জন্য উপকারী। কারণ এ বিধানগুলোকে সাধ্যমতো বোঝার পর, মানুষ নিজের জীবনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

ইবরাহীম বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান। তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। ফলে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল... (সূরা বাকারা, ২: ২৫৮)

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৪০)।

যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনোই কোনো পরিবর্তন পাবেন না। (সূরা আহযাব, ৩৩: ৬২)

কাজেই মুসলিমের সামনে থাকা পথ স্পষ্ট ও সোজা। ফরজ দায়িত্বগুলো পালন করা, স্পষ্ট হারাম থেকে দূরে থাকা, হালাল-হারামের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা এবং এতে ব্যস্ত রাখা নিজেকে। যতটুকু সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে গিয়ে গায়িবের জগৎকে বোঝার চেষ্টা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝতে হবে। মানুষের কাজ এতটুকুই। আমরা পালন করতে পারব না, এমন কোনো দায়িত্ব মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। তিনি আমাদের এমন কিছু জানার জন্য বাধ্য করেননি, যা আমাদের বোধশক্তির বাইরে। এমন কিছু তিনি হারাম করেননি, যা থেকে

দূরে থাকা অসম্ভব। আল্লাহ মানুষের ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপান না। এই কথা বিশ্বাস করা ছাড়া কারও ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন,

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভালো যা উপার্জন করে, তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে, তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়... (সূরা বাকারা, ২: ২৮৬)

আর যখনই তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।' বলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছো, যা তোমরা জানো না?' বলুন, 'আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' আর প্রত্যেক সাজদা বা ইবাদাতে তোমাদের লক্ষ্য ও মনোযোগকে (তাঁর প্রতি) নিবদ্ধ করো, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকো। যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে, (তোমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে) সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭: ২৮-২৯)

এই শিক্ষাগুলোর মাধ্যমে বিশ্বাস এবং কাজের সঠিক ভারসাম্য আসে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের ভেতর কল্যাণের তাড়না তৈরি করে। তাকে দৃঢ় ও কার্যকরী হতে সাহায্য করে। একইসাথে মানুষকে করে স্রষ্টার অভিমুখী। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অলসতা, উদ্যমহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা আর জল্পনাকল্পনার শেকড় কেটে দেয়। বন্ধ করে দেয় নিজ দায়িত্ব ভুলে নিজের গুনাহকে তাকদীরের ওপর ন্যস্ত করার পথ।

একজন মুসলিম জানে মহান আল্লাহ কুফর এবং সত্যের প্রত্যাখ্যান নিয়ে সন্তুষ্ট নন। বিশ্বাসীদের মধ্যে ফাহিশা এবং অশ্লীলতার প্রসার হোক, তা তিনি পছন্দ করেন না। ব্যক্তি নিজে মন্দ থেকে বিরত থাকবে; কিন্তু সমাজে মন্দের প্রতিরোধ নিয়ে ভাববে না, মানুষ সত্যকে জানবে; কিন্তু সত্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে না, সাধ্যমতো সমর্থন করবে না সত্যকে -এটি মহান আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়। মানুষ পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে না, এটিও মহান আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়।

মুসলিম জানে, দুনিয়া হলো পরীক্ষা। ভালো এবং মন্দের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, কাজ, পরিস্থিতি-একেকটা পরীক্ষা। বিচারের দিনে

মানুষের হিসাব নেওয়া হবে, প্রতিদান দেওয়া হবে তার ভালো ও মন্দ কাজের। মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ খলীফা। মহাবিশ্বে তাকে সম্মানিত অবস্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে সে পুরস্কৃত হবে। আর এই দায়িত্ব যদি সে পালন না করে অথবা আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ব্যর্থতার কারণ সাহসিকতার অভাব কিংবা দায়িত্ব এড়ানো-যাই হোক না কেন, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

একদিকে সৃষ্টিজগতে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হলো সে মহান আল্লাহর গোলাম। এ দুই দিকের মধ্যেও ভারসাম্য আছে। এই ভারসাম্য ইসলামকে ওই সব বিপর্যয় থেকে হেফাযত করেছে যেগুলো অন্যান্য ধর্ম, দর্শন এবং বিশ্বাসব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে।

মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলীফা। এই পৃথিবীর সবকিছুর ওপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। মহাবিশ্বের বিন্যাসে এটাই মানুষের নির্ধারিত ভূমিকা, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিল সে অস্তিত্বে আসার আগেই।

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি জমিনে খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না।' তারপর তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন।' অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও জমিনের গায়িব জানি। আরও জানি, যা তোমরা ব্যক্ত করো এবং যা তোমরা গোপন করে রাখো। (সূরা বাকারা, ২: ৩০-৩৩)

আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত কিছু। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা জাসিয়া, ৪৫: ১৩)

আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো। (সূরা নাহল, ১৬: ১৫)

আপনি কি দেখতে পান না যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তিনি তোমাদের কল্যাণ-কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। আর নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে তাঁর হুকুমেই? তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তা পৃথিবীতে পতিত না হয় তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ মানুষের প্রতি নিশ্চিতই বড়ই করুণাশীল, বড়ই দয়াবান। (সূরা হাজ্জ, ২২: ৬৫)

মানুষ যখন অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে বের হয়ে কেবল আল্লাহর দাসত্ব করে, তখনই সে সত্যিকার অর্থে মুক্ত হয়। নিজেকে পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণ ভারসাম্যে আসে। সে অর্জন করে বাকি সব সৃষ্টি ও মহাবিশ্বের সাথে ভারসাম্য। আর মানবীয় উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত হলেন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার কোনো বৈশিষ্ট্য আরোপ করা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম। অগুস্ত কন্টের পসিটিভিসম বলে, সকল প্রাণী এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনকারী প্রকৃতি। তাদের দর্শনে প্রকৃতিকে একরকম দেবতার আসনে বসানো হয়। অনেকে আবার বস্তুজগতের একটি নির্দিষ্ট দিক; অর্থনীতিকে দেবত্বের আসনে বসিয়েছে। যেমন: মার্ক্সবাদের মতে মানুষ ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার মূল শক্তি হলো অর্থনীতি।

আজ অনেকে মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুমোদন ছাড়াই। তাদেরকে যেন মানুষের জন্য আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেন তারা মানুষের ওপর সার্বভৌম কোনো শক্তি! যারা এমন কাজ করে, তারা আসলে মহান আল্লাহ পবিত্র বৈশিষ্ট্য নিজেদের জন্য দাবি করে। এই দর্শনগুলো বিভিন্ন প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে এগুলোর দূরত্ব অনতিক্রম্য।

ইসলাম মানুষকে সম্মানিত করে, কিন্তু বস্তুজগৎকে হেয় করে না। মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনকারী, অভিভাবক, মালিক। মানুষ এবং বস্তুজগৎ তাঁর সৃষ্টি। দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক ভারসাম্য এবং সহযোগিতার। মানুষ মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত। বস্তুর ওপর মানুষকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, যাতে সে এর রহস্য জানতে পারে। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী একে পরিবর্তন করতে পারে, কাঠামো দিতে পারে, রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান বিশ্বাসী মানুষকে বিনয়ী করে, তার মনে তৈরি করে শ্রদ্ধার অনুভূতি। ইসলামের শিক্ষা মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়, তার জীবনকে অর্থবহ করে। মর্যাদার জন্য মানুষকে তখন বস্তুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অতএব, কেবল এবং কেবলমাত্র পৃথিবীতে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য আনয়ন ও রক্ষা করা সম্ভব, অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা সেটা আজ পর্যন্ত কোনদিন সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা।

শেষের আগে

উপরোল্লিখিত সমস্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার দাসে পরিণত করে। সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার আগে মানুষ সত্যিকার অর্থে আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে উঠতে পারে না। সব ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যে কেবল ইসলামই সার্বভৌমত্ব এবং চূড়ান্ত আইনপ্রণয়ন এক আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে। এভাবে সৃষ্টির আনুগত্য থেকে বের করে এনে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি অনুগত করে। যে ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব মানুষের, সেখানে মানুষ গোলামি করে মানুষের। কিন্তু ইসলামে এবং কেবল ইসলামেই প্রতিটি মানুষ এই ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামি করে। এটাই মানুষের সত্যিকার মুক্তি, এটাই হলো মানুষের জন্ম। সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল প্রকৃত অর্থে মানুষের জন্ম হয়। এ দাসত্ব বিশ্বাস কিংবা বিবেকের হতে পারে কিংবা হতে পারে আইনকানুন, আচরণ কিংবা জীবনব্যবস্থারও। ইসলামি জীবনব্যবস্থা ছাড়া প্রকৃত মানবতা পূর্ণাঙ্গভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে না। মহান আল্লাহর একত্ব ও তার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এমন এক আসমানি উপহার, যা মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য আরও একটি উপহার নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”। (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

ঈমানদাররা পুরো মানবজাতিকে এই উপহার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। মুসলিমরা এই নিয়ামাত ভাগ করে নিতে চায় সবার সাথে। যাতে অন্যরাও এ উপহার থেকে উপকৃত হতে পারে, সন্তুষ্ট করতে পারে মহান আল্লাহকে। এটাই সেই মহান বার্তা, যা তাওহীদে বিশ্বাসীরা মানবজাতির কাছে আজ পৌঁছে দিতে পারে। যেভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের মহান পূর্বপুরুষরা। আজও মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে এই বার্তা গ্রহণ করে। তাওহীদের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। ইসলাম এমন কিছু দেয়, যা আজ মানবজাতি

হারিয়ে ফেলেছে। এমন কিছু যা অন্য কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, বিশ্বাস, মতবাদ, মতাদর্শ কিংবা সংবিধান দিতে পারে না।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ যে ধরনের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে, এর আলোকে মুসলিমরা সৃষ্টিজগতের মাঝে যেভাবে নিজেদের ভূমিকাকে দেখে-সেই পুরো উপলব্ধিকে এই অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ধারণ করা যায়। মুসলিমের দায়িত্ব হলো পুরো বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া-

নিশ্চয়ই ইসলাম হলো মানুষের গোলামি থেকে মহান আল্লাহর গোলামির দিকে যাত্রা। সবকিছু; তা এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা আখিরাতের, মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চালানোর সংকল্প। মহান আল্লাহর পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত করার প্রতিজ্ঞা।

ইসলাম হলো সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে মানুষকে ফিরিয়ে আনা। জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব বিষয়ে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ ও বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা শুধু তাঁকেই। আল্লাহর কাছে একান্ত আত্মসমপর্ণ করা ছাড়া মানুষ কখনো মুক্ত হতে পারে না, কখনো সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যে তাঁর আনুগত্য ভাগ করে একভাগ আল্লাহকে দেয়, আরেক ভাগ অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে বিশ্বাসী হতে পারে না। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা একমাত্র আল্লাহর প্রতি -এই উপলব্ধি ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউ আঁকড়ে ধরে, তাওহীদের পতাকা উঁচিয়ে তুলে মুসলিমরা মানবজাতিকে আজ সেই পথ বাতলে দিতে পারে। আজ সৃষ্টির গোলামিতে হাবুডুবু খাচ্ছে মানবজাতি। সামগ্রিকভাবে তাওহীদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরাই পারে সৃষ্টির গোলামি থেকে বের করে এনে মানবজাতিকে এক আল্লাহর গোলামিতে প্রবেশ করাতে। এভাবেই মানুষ পারে নিজেকে মুক্ত করতে, প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে।

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ফেরার প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে তাওহীদে বিশ্বাসীরা বিশ্বকে এমন কিছু দিতে পারে, যা অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ, ব্যবস্থা, দর্শন কিংবা সংবিধানে পাওয়া যায় না। পুরো বিশ্বের রূপান্তরে ভূমিকা রাখার এ এক মহান ও ঐতিহাসিক সুযোগ। আজ যারা তাওহীদের এ পতাকা উঁচিয়ে ধরবে, তাদের ভূমিকা হবে পুরো মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার। ঠিক যেমন চৌদ্দশ বছর আগে ইসলামের প্রথম প্রজন্ম মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল জাযিরাতুল আরব থেকে।

আজ মুসলিমদের দেখানোর মতো কোনো বৈজ্ঞানিক কিংবা প্রযুক্তিগত অর্জন নেই। চোখধাঁধানো সভ্যতাগত অর্জন নেই, যা দেখে পৃথিবীর বাকি মানুষ দলে দলে ছুটে আসবে তাঁদের কাছে। কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাসীরা মানবজাতিকে এমন কিছু দিতে পারে, যা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং সভ্যতাগত অর্জনের চেয়েও অনেক অনেক মূল্যবান। আর তা হলো মানুষের মুক্তি-না, শুধু মানুষের মুক্তি নয়, বরং সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্ম, যেমনটা মহান আল্লাহ চেয়েছেন।

তাওহীদের বিশ্বাসীরা মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিতে পারে, এমন এক ব্যবস্থা যার ভিত্তি হলো মানুষের মর্যাদা এবং সব ধরনের বন্দিত্ব থেকে মানুষের বিবেক ও আত্মার মুক্তি। তখন সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে-শক্তিশালী ও মর্যাদাবান, যেমনটা আল্লাহ চেয়েছেন। মানুষ তখন আর পুঁজি, পণ্য, যন্ত্র, মতাদর্শ কিংবা নশ্বর মানুষের গোলামি করবে না। আল্লাহর খলীফা হিসেবে সে মহান আবিষ্কার করবে, সভ্যতার নতুন নতুন পথ উন্মোচন করবে, সে অবস্থান করবে মুক্তির শিখরে, মর্যাদার সাথে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন বিধান যা গণতন্ত্রের সঠিক রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এর মাধ্যমেই বিশ্বে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। ইতিপূর্বে মানবসৃষ্ট গনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যদ্দরুণ কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গভাবে গণতন্ত্রের আদর্শ গৃহীত হয়নি। ফলে গণতন্ত্র এক পর্যায়ে স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে। কখনো কখনো তা গণতন্ত্রের আড়ালে একনায়কতন্ত্রের আদলে পরিচালিত হতে থাকে। আবার কোনো দেশে তা ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। ফলে তা দমনে গর্জে উঠে অত্যাচারিত জনগণ। তখনই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিশ্বনেতারা আদর্শের বুলি ছড়িয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের ইতিবাচক অবস্থানের জানান দেন। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকলের নীরবতা বিশ্ববাসীকে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলে। এতে প্রত্যেক দেশের জনগণকে তাদের লড়াই একাই লড়ে যেতে হয়। অপরদিকে, ইসলাম প্রবর্তিত গণতন্ত্র কেবল প্রচারে নয় প্রয়োগেও তার শতভাগ কার্যকারিতা দেখিয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ইসলামী গণতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। তবেই মানবজাতি প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তির স্বাদ ভোগ করতে পারবে, আর কায়েম হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন।

যদি কল্যাণময় কিছু বলে থাকি, তাহলে নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা তো জগৎসমূহের মালিক আল্লাহ তাআলারই। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

তথ্যসূত্রঃ

- আল কুরআন
- সহীহ বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- নেদায়ে তাওহীদ- আবু উমার আল-মুহাজির
- ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলনীতি- সাইয়্যিদ কুতুব, অনুবাদঃ আসিফ আদনান
- অনলাইন জার্নালঃ ইসলামী গণতন্ত্র বনাম প্রচলিত গণতন্ত্র: প্রেক্ষিত ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান
- হক, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল। ২০১৯। পৌরনীতি ও সুশাসনা ঢাকা: হাসান বুক হাউস
- সাদি, এস.এম সাদি, ২০১০। বাঙালির গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (সম্পাদিত)। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ।
- খান, ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান ও মোখলেছুর রহমান। ২০১৬।
- মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঢাকা: উপমা প্রকাশন।
- তাহের, মোঃ আবু তাহের। ২০০৯। ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ঢাকা: কবির পাবলিকেশন্স।
- হাসান, খন্দকার মাহমুদুল হাসান। ২০১৬। সভ্যতার বিকাশে ইসলাম। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- আলী, স্যার সৈয়দ আমীর। ২০২৪। দ্য স্পিরিট অব ইসলাম। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান অনূদিত। ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী।
- হুসাইন, মুহাম্মদ শাহাদাৎ হুসাইন। ২০১৭। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু) সংগ্রামী জীবন। চট্টগ্রাম: জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স।
- হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ। ২০০৫। ইসলাম পরিচয়। মুহাম্মদ লুতফুল হক অনূদিত। ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।

- হালিম, ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম। ২০১৭। খোলাফায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। চট্টগ্রাম:আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন।
- গণি, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান। ২০২২। সাহাবায়ে কিরামের জীবনী। চট্টগ্রাম: চিশতী প্রকাশনী।
- নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী। ২০১৯। মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ. অনূদিত। ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা।
- ইবনু কাসীর, হাফিয ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল। ২০২২। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- রীয়াজ, আলী। ২০২৫। আমিই রাষ্ট্র। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
- খতিব, ফিরাস আল খতিব। ২০২১। লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি। আলী আহমাদ মাবরুর অনূদিত। ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন।
- আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ
- শরহু আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ
- আকীদাতুত তহাবী
- শরহে আকাইদ
- আকীদাতুল ওয়াসেভিয়্যাহ
- কিতাবুত তাওহীদ
- কেফায়াতুল মুস্তাযীদ শরহু কিতাবিজ তাওহীদ
- তাফসীরে কুরতুবী
- তাফসীরে সমরকন্দী
- আল-আরশীফুল জামে'য়
- তাফসীর ইবনে কাসীর
- তাফসীরু ফাতহিল কাদীর
- ই'লামুল মুআক্কিয়ীন
- তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন
- আত-তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী
- সুনানে তিরমিযি

- মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী
- আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী
- তাফসীরুত তবারী
- আহকামুল কুরআন
- আল-ফিছাল
- রূহুল মাআ'নী
- তাফসীরে মাযহারী
- তাফসীরে বাগাবী
- আদওয়াউল বায়ান
- তাফসীরে আবুস সাউদ
- আদ-দাওয়াউল আ-জিল
- মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্
- আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস
- আদ-দুররা
- সুনানুল বাইহাকী
- আহকামু আহলিয যিম্মাহ
- আল-ফাতাওয়াল কুবরা
- তাফসীরুল খাযেন
- প্রাগুক্ত
- হাল নাহনু মুসলিমুন?- মুহাম্মাদ কুতুব
- আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা- মুহাম্মাদ কুতুব
- Islam at the Crossroads (১৯৫৫),- মুহাম্মাদ আসাদ ('সংঘাতের মুখে ইসলাম' নামে বাংলায় অনূদিত। - অনুবাদক)